দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ধনতেরাস এখন
বাঙ্গালিরও উৎসব
— পৃঃ ২৩

সন্ত্রাসবাদীদের মতো কথা
বলছেন অভিষেক
— পৃঃ ৩৫

৭৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ১৭ অক্টোবর, ২০২২।। ৩০ আশ্বিন - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

বাঙ্গালির ধনতেরাস

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ৩০ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৭ অক্টোবর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

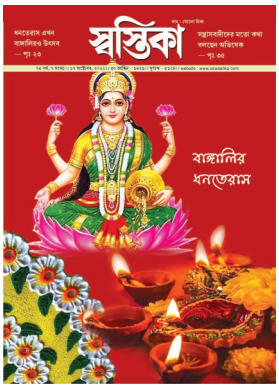

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সমাজের সহযোগিতাই দেশের ঐক্য নিশ্চিত করতে পারে : শ্রী মোহনরাও ভাগবত □ ৬

মধ্যপ্রাচ্যের ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে তৈরি ভারত □ দিব্যেন্দু বটব্যাল □ ১১

বদলে যাচ্ছে ভারতীয় সিনেমা □ রক্তিম দাস □ ১৩

সেবা ও সমর্পণ ভাবনার অগ্রপথিক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় □ বিনয়ভূষণ দাশ □ ১৫

ধনতেরাস এখন বাঙ্গালিরও উৎসব □ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় □ ২৩

বিশ্বে আবিষ্কৃত অর্ধেক মৌলিক কণারই নামকরণ হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের নামে □ দীপক খাঁ □ ৩১

সাংখ্যদর্শনের ফলিত রূপকল্প যোগদর্শন □ কৃষ্ণচন্দ্র দে □ ৩৩

গুরু অর্জন দেব শিখধর্মের অন্যতম স্তম্ভ □ কৌশিক রায় □ ৩৪

সন্ত্রাসবাদীর মতো কথা বলছেন অভিষেক □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ৩৫

ক্ষমতার চশমা দিয়েই বাইরের জগৎ দেখছে স্বৈরাচারী অভিষেকরা □ বিমল শঙ্কর নন্দ □ ৩৮

হিন্দুত্বই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্র □ পিন্টু সান্যাল □ ৪৩

দিদি কি বেহালা বাজাতেও পারেন? □ সুন্দর মৌলিক □ ৪৮

চুরি আমাদের ভিত্তি, জেল আমাদের ভবিষ্যৎ □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
২৪ অক্টোবর
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৪ অক্টোবর
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বাঙ্গালির কালীসাধনা

প্রতি বছরের মতো এবারও শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে স্বস্তিকা প্রকাশ করবে বিশেষ দীপাবলী সংখ্যা। এবারের বিশেষ আকর্ষণ— বাঙ্গালির কালীসাধনা। সাধক রামপ্রসাদ ও পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে নিয়ে দুটি বিশেষ নিবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ও নন্দলাল ভট্টাচার্য। এছাড়া কলকাতার করুণাময়ী কালীর মহিমা তুলে ধরেছেন নিখিল চিত্রকর। স্বস্তিকার পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য স্বস্তিকার পক্ষ থেকে রইল দীপাবলীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন শুভপ্রদ নহে

এক সময় ভারতবর্ষে রাজনীতিকে নীতির রাজা বলা হইত। কিন্তু কালক্রমে তাহা রাজার অর্থাৎ শাসকের নীতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ নীতিতে রাজ্য শাসন করিয়া সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ভারত শাসকদের নিকট যখন রাজনীতি নীতির রাজা হিসারে পরিগণিত হইত, তখন ভারতবর্ষ বিশ্বগুরু হিসাবে উন্নীত হইয়াছিল। রাজনীতির যখন হইতে রাজার নীতিতে অবনমন ঘটিয়াছে তখন হইতেই অধঃপতনের শুরু হইয়াছে। ক্ষুদ্র রাজনীতির কারণেই দেশ দীর্ঘ পরাধীনতার শিকার হইয়াছিল। ক্ষুদ্র রাজনীতির কারণেই দেশমাতৃকা খণ্ডিত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের শাসকরা তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। ক্ষুদ্র রাজনীতি তাহাদের মন ও মস্তিষ্ক দখল করিয়া বসিয়াছে। ফলস্বরূপ স্বাধীনতার বহু বৎসর ভারতবাসী দেশের উন্নয়নের চিত্র দেখিতে পান নাই। শুধু ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য দেশের নেতৃবর্গ দেশ গঠনের সেই মহালগ্নেই রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের আমদানি করিয়াছেন। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষকে গণতন্ত্রের প্রহরী বলা হয়। ইহার জন্যই সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলনেতাকে সমান মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতের শাসকবর্গ ক্ষুদ্র রাজনীতির স্বার্থে বিরোধী পক্ষকে শত্রু অথবা শ্রেণীশত্রু বলিয়া মনে করিয়াছে। ইহার জন্যই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মতো দেশনেতাকে হত্যা করা হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো জননেতাকে রহস্যজনক মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন নূতন কথা নহে। বাম আমলে তাহা পাকাপোক্ত স্থান করিয়া লইয়াছে। ষাটের দশকে মাও-সে-তুঙের স্লোগান ছিল বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। মাও-সে-তুঙের শিষ্য বামেরা ৩৪ বৎসর বন্দুকের নলের সাহায্যেই রাজ্য শাসন করিয়াছে। বঙ্গভূমি তাহারা মানুষের রক্তে লাল করিয়াছে। বন্দুক তাহাদের হাতে ছিল, ক্ষমতা তাহাদের হাতে ছিল, তাই প্রশাসনও তাহাদের সুরেই কথা বলিয়াছে। ৩৪ বৎসর তাহাদের বন্দুকের ভয়ে রাজ্যের মানুষ থরথর কাঁপিয়াছে। নির্বাচনের নামে প্রহসন হইয়াছে। বর্তমান শাসকদল বামেদেরই সার্থক উত্তরসূরী। এক প্রবীণ রাজনীতিকের কথায় মমতা ব্যানার্জি হইলেন বামেদের মেধাবী ছাত্রী। বিরোধী পক্ষকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। এই রাজ্যে প্রকাশ্য সভায় শাসকদলের পক্ষ হইতে পুলিশকে বোমা মারিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত অথবা অভিযুক্ত নেতা-নেত্রী ও সমর্থককে শীর্ষনেত্রীর নিকট হইতে নির্দোষিতার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। স্বয়ং নেত্রী থানায় যাইয়া অভিযুক্তকে ছাড়াইয়া আনেন। শাসকদলের গুন্ডাদের ভয়ে থানার ভিতরে পুলিসকে টেবিলের তলায় লুকাইয়া পড়িতে হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নে পূর্বাপর সর্বপ্রকার কৃতিত্বকে ম্লান করিয়া শীর্ষতম স্থানে উঠাইয়া আনিয়াছে বর্তমান শাসকদল। এই রাজ্যে তাহারা ইহার নাম দিয়াছেন 'উন্নয়ন'। বিরোধীদের সামনে পথে ঘাটে মূর্তিমান উন্নয়ন দাঁড়াইয়া থাকে। এই উন্নয়নের দাপটে গত বিধানসভা ভোটের পর হইতে আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র বিজেপির ৫৮ জন কর্মী-সমর্থকের প্রাণ গিয়াছে। এই বিষয়ে ইদানীং শীর্ষনেত্রীরও উর্ধ্বে উঠিয়াছেন তাঁহারই দলের একজন সাংসদ। তিনি বিরোধীদলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের কপালের মাঝখানে গুলি করিবার পরামর্শ পুলিশকে দিয়াছেন। রাজ্যের শাসকদলের বোধহয় বিস্মরণ ঘটিয়াছে যে তাহাদের পূর্বসূরী অত্যাচারী বামেদের ইহার জন্যই বিদায় লইতে হইয়াছে। অত্যাচারী শাসকদের বিশ্বের দেশে দেশে মানুষ নির্মমভাবে উৎখাত করিয়াছে। পলপট, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, নিকোলে চেচেস্কু, জোসেফ টিটো প্রভৃতিকেও মানুষ ক্ষমা করে নাই। কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের পর শুধুমাত্র রাশিয়াতেই এক হাজারেরও বেশি লেনিনমূর্তি মানুষ ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলেরও শেষের দিন শুরু হইয়াছে, তাহার সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের বাড়বাড়ন্ত দেশের মানুষের মনে এক নেতিবাচক প্রভাব ফেলিয়াছে। বিশেষ করিয়া যুব প্রজন্মের মনে। বর্তমানে দেশে আশি কোটিরও অধিক যুবপ্রজন্ম। এই বিশাল সংখ্যক নাগরিক রাজনীতি হইতে দূরে থাকিবার মনস্থ করিয়াছে। একটি সমীক্ষায় জানা গিয়াছে, দেশের ত্রিশ শতাংশ মানুষ বুথমুখী হন না। ভোটদানে বিরত থাকেন। মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত গণতন্ত্র যে সাফল্যমণ্ডিত হয় না তাহা জানিয়াও তাহারা এই সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বলা হইয়া থাকে যে, রাজনীতিতে অনীহা প্রদর্শনের অন্যতম শাস্তি হইল নিজের চাইতেও নিকৃষ্টদের দ্বারা শাসিত হওয়া। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে যে অনীহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা দেশের পক্ষে মোটেই শুভপ্রদ নহে।

সুভাষিতম্

ন রাজ্যং ন রাজাসীৎ ন দণ্ড্যো ন চ দাণ্ডিকঃ।
ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি চ পরস্পরম্।।

(পুরাকালে) কোনো রাজ্য ছিল না। কোনো রাজা ছিল না; দণ্ড ছিল না, দণ্ডদাতা ছিল না। মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে পরস্পরকে রক্ষা করতেন।

সমাজের সহযোগিতাই দেশের ঐক্য নিশ্চিত করতে পারে : শ্রী মোহনরাও ভাগবত

নবরাত্রির শক্তিপূজার পর আশ্বিন শুক্ল দশমীর দিন আমরা প্রতি বছরের মতো এবারও বিজয়া দশমী উৎসব পালন করতে এখানে একত্রিত হয়েছি। শক্তিস্বরূপা জগজ্জননীই মঙ্গলকারী সংকল্পের সফলতার আধার। সর্বত্র পবিত্রতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও শক্তির আশ্রয় অপরিহার্য। ঘটনাক্রমে, শ্রীমতী সন্তোষ যাদব, যিনি আজ প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ উপস্থিতিতে আমাদের বাধিত ও আনন্দিত করেছেন, তিনি সেই শক্তি ও চৈতন্যেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি গৌরীশঙ্করের উচ্চতাকে দুই-দুইবার পায়ে হেঁটে পার করেছেন।

সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সমাজের প্রবুদ্ধ ও সমর্থ নারীদের উপস্থিতির প্রথা পুরাতন। ব্যক্তিনির্মাণের জন্য শাখা পদ্ধতি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সঙ্ঘ ও রাষ্ট্র সেবিকা সমিতিতে পৃথক পৃথক ভাবে চলে। অন্য সব কাজে নারী-পুরুষ মিলিতভাবেই কার্য সম্পাদন করে থাকেন। ভারতীয় পরম্পরাকে এই পরিপূরকতার দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিচার করা হয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণকে আমরা ভুলে গেছি, মাতৃশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। অনবরত আক্রমণের পরিস্থিতি এই মিথ্যাচারকে সাময়িক বৈধতা দিয়েছে এবং তাকে একটি অভ্যাসরূপে পরিণত করেছে। ভারতের নবজাগরণের ঊষাকালের প্রথম উন্মেষ থেকেই আমাদের দেশের মনীষীরা এই গোঁড়ামি পরিত্যাগ করেছিলেন। মাতৃশক্তিকে দেবতার স্বরূপ মেনে পূজার ঘরে তাঁদের বন্দি রাখা কিংবা রান্নাঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করা — এই দুটি চরম পন্থা পরিহার করে তাঁদের প্রবোধন ও ক্ষমতায়ন-সহ সমাজের সকল কাজে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া-সহ সর্বত্র সমান অংশগ্রহণের ওপরই জোর দিয়েছেন। নানা ধরনের অভিজ্ঞতায় হোঁচট খাওয়ার পর বিশ্বে বিরাজমান ব্যক্তিবাদী ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও এখন ধীরে ধীরে এই বিচারধারাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। ২০১৭ সালে বিভিন্ন সংগঠনে কর্মরতা মহিলা কার্যকর্তারা একত্রিত হয়ে ভারতের মহিলাদের বিষয়ে ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ সমীক্ষা চালিয়েছে। সেই সমীক্ষার ফলাফল সরকারের কাছে পৌঁছেও দেওয়া হয়েছে। সেই সমীক্ষায় মাতৃশক্তির জাগরণ, ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের সমান অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। পারিবারিক স্তর থেকে শুরু করে এই কাজকে সংগঠন পর্যন্ত গ্রহণ ও প্রচলিত করতে হবে। কেবলমাত্র তখনই মাতৃশক্তি-সহ সমগ্র সমাজের সংহতি রাষ্ট্রীয় নবোত্থানে নিজ ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হবে।

এমনকী সাধারণ মানুষও এখন এই

রাষ্ট্রীয় নবোত্থানের প্রক্রিয়াটি অনুভব করছে। শক্তি, শীল ও জাগতিক প্রতিপত্তিতে আমাদের প্রিয় ভারতের প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি দেখে আমরা সবাই খুশি। সমস্ত ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার দিকে পরিচালিত নীতি অনুসরণকে সরকার পুরস্কৃত করছে। এখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতের গুরুত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমরা দিন দিন স্বাবলম্বী হচ্ছি। করোনার বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুতগতিতে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে আমাদের অর্থনীতি পূর্বাবস্থা ফিরে পাচ্ছে। আপনারা ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লিতে কর্তব্যপথের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আধুনিক ভারতের এই অগ্রযাত্রার অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর বর্ণনা শুনেছেন। সরকারের এই স্পষ্ট উদ্‌ঘোষ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তবে এই পথে আমাদের সকলকে কথায়,কাজে ও চিন্তায় এক হয়ে চলতে হবে। সরকার, প্রশাসন ও সমাজের কর্তব্য স্পষ্ট এবং সমানভাবে আমাদের রাষ্ট্রের স্বরূপকে অনুধাবন করা— এটি স্বনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। নিজ নিজ জায়গায় এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে কিছু নমনীয়তা অবলম্বন করতে হয়। তখন পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বাস একত্রিত হয়ে অগ্রগতির পথ বজায় রাখে। চিন্তার স্বচ্ছতা, সমান দৃষ্টি, দৃঢ়তা, নমনীয়তা, নিজের সীমা সম্পর্কে সচেতনতা ভুলভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করে। সরকার, প্রশাসন, বিভিন্ন ধরনের নেতৃবর্গ ও সমাজ স্বার্থপরতা ও ভেদাভেদকে ঊর্ধ্বে রেখে সহমর্মী হয়ে কর্তব্যের পথে যদি অগ্রসর হয়, তাহলে দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। সরকার, প্রশাসন ও নেতারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। সমাজকেও চিন্তাভাবনা করে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এই নবজাগরণের প্রক্রিয়ার বাধাগুলি অতিক্রম করার জন্য এখনও কাজ করতে হবে। প্রথম বাধা হলো গতানুগতিকতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান বাড়তে থাকে। সময়ের সাঙ্গে সঙ্গে কিছু বিষয় বদলায়, কিছু হারিয়ে যায়। কিছু নতুন বিষয় ও পরিস্থিতির জন্ম হয়। তাই নতুন রচনা নির্মাণ করতে গিয়ে প্রাচীনকাল ও সমকালের সমন্বয় করতে হবে। সেকেলে ভাবনা পরিত্যাগ করে নতুন যুগোপযোগী ও দেশানুকূল ঐতিহ্য তৈরি করতে হবে। আমাদের পরিচয়, সংস্কৃতি ও জীবন সম্পর্কে শাশ্বত মূল্যবোধকে ত্যাগ করা উচিত নয়। বরং সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাব্যঞ্জক আচরণ করা যাতে তা পূর্ববৎ থাকে, তারজন্য সাবধানতা বজায় রাখতে হবে। নতুন যুগবান্ধব ও দেশবান্ধব ঐতিহ্য তৈরি করতে হবে।

দ্বিতীয় ধরনের বাধা এমন শক্তি তৈরি করে, যারা ভারতের ঐক্য ও অগ্রগতি চায় না। মিথ্যা ও অসত্য তথ্যের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানো, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা এবং সমাজে সন্ত্রাস, বিভেদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টির তাদের পদ্ধতির অভিজ্ঞতা আমরা ইতিমধ্যে অনুভব করেছি। স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দূরত্ব ও শত্রুতা সৃষ্টির কাজ স্বাধীন ভারতেও তারা করে চলেছে। কোনোরকম প্ররোচনায় পা না দিয়ে ভাষা, ধর্ম, প্রদেশ ও নীতির পরোয়া না করে তাদের বিষয়ে সমস্ত রকম মোহ পরিত্যাগ করে কঠোরভাবে তাদের প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হবে। সরকার ও প্রশাসনের এই নিয়ন্ত্রণের ও দূরীকরণের প্রচেষ্টায় আমাদের সহায়ক হওয়া উচিত। শুধুমাত্র সমাজের সবল ও সফল সহযোগিতাই দেশের নিরাপত্তা ও ঐক্য সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে পারে।

সমাজের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছাড়া কোনো ভালো কাজ বা কোনো পরিবর্তনই সফল ও স্থায়ী হতে পারে না, এটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা। মানুষ মন থেকে মেনে না নিলে কোনো ভালো ব্যবস্থাও চলতে পারে না। পৃথিবীতে সমস্ত বড়ো ও স্থায়ী পরিবর্তন সমাজের জাগরণের পরই কেবল ব্যবস্থা ও তন্ত্রে পরিবর্তন এসেছে। মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি নীতিমালা নির্মাণ অত্যন্ত সঠিক ধারণা। নতুন শিক্ষানীতির অধীনে সরকার/প্রশাসনও সেদিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে। কিন্তু অভিভাবকরা কি চান যে তাদের সন্তানদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোক? নাকি তথাকথিত অর্থনৈতিক সুবিধা বা ক্যারিয়ারের (যার জন্য শিক্ষার চেয়ে বেশি উদ্যোগ, সাহস ও বোঝাপড়ার প্রয়োজন) জন্য আপনার সন্তানদের মরীচিকার পেছনে দৌড় করাতে চান? সরকারের কাছে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রত্যাশা করতে গিয়ে এটাও দেখতে হবে আমরা মাতৃভাষায় স্বাক্ষর করি কি না? আমাদের বাড়িতে নামফলক মাতৃভাষায় আছে কি না? মাতৃভাষায় নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয় কি না?

নতুন শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার্থী যেন একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠে, তার মধ্যে যেন দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, সে যেন হয়ে ওঠে একজন সুসংস্কারযুক্ত নাগরিক। কিন্তু সুশিক্ষিত, সচ্ছল ও প্রবুদ্ধ অভিভাবকরাও কি শিক্ষার এই সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠান? তদুপরি শিক্ষা শুধু শ্রেণীকক্ষে নয়। বাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সমাজের শিষ্টাচার ও সামাজিক শৃঙ্খলার যথাযথ পরিবেশ বজায় রাখার এবং জননেতাদের ভূমিকা ও সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন, পালাপার্বণ, উৎসব ইত্যাদিরও সমান গুরুত্ব রয়েছে। এই বিষয়ে আমরা কতটা যত্নশীল? এটি ছাড়া এবং কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষা কখনোই কার্যকর হতে পারে না।

বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা স্বল্পমূল্যের, ভালো মানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সর্বজনীনভাবে সহজলভ্য এবং বাণিজ্যিক মানসিকতামুক্ত একটি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠা করতে হবে— এটাও সঙ্ঘের প্রস্তাব। সরকারের অনুপ্রেরণায় ও সহযোগিতায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতা, যোগ ও ব্যায়ামের উদ্যোগও পরিচালিত হয়। সমাজে অনেকেই এমন আছেন যারা এসবের প্রতি আগ্রহী এবং অন্যদেরও এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে সমাজ যদি পুরনো ধাঁচে চলতে থাকে, তাহলে এমন কী ব্যবস্থা আছে যা সবার স্বাস্থ্য

ঠিক রাখতে পারবে?

সংবিধানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের পথ সুগম হয়েছে, কিন্তু সামাজিক সমতা না আনলে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আসবে না। এমনই সাবধানবাণী ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর আমাদের শুনিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সামাজিক বৈষম্য টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অনেক নিয়ম তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু বৈষম্যের মূল নিহিত রয়েছে মনের মধ্যে এবং আচরণে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্তরে বন্ধুত্বের সম্পর্ক যদি স্বতঃস্ফূর্ত, অনৌপচারিক যাতায়াত, ওঠা-বসার সম্পর্ক গড়ে না ওঠে, আর সামাজিক স্তরে মন্দির, জল,শ্মশান সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত না হয়, ততদিন সমতার কথা শুধু স্বপ্নের মধ্যেই থেকে যাবে।

ব্যবস্থায় আমাদের ঈপ্সিত পরিবর্তনগুলি আমাদের আচরণে আনলে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া গতি ও শক্তি পায়, স্থায়ী হয়। এটি না হলে পরিবর্তন অবরুদ্ধ হতে পারে এবং পরিবর্তন স্থায়িত্বের দিকে এগোয় না। সমাজের একটি নির্দিষ্ট মানসিকতা তৈরি করা পরিবর্তনের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ভোগ ও শোষণমুক্ত আদর্শের ভিত্তিতে উন্নয়ন সাধন করতে হলে সমাজের গোড়া থেকে এবং নিজের জীবন থেকে ভোগ ও শোষণের প্রবণতা দূর করতে হবে।

ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন নীতি কর্মসংস্থানমুখী হবে, এমনটাই আশা করা স্বাভাবিক। তবে রোজগার মানে শুধু চাকরি নয়— এই বোধও সমাজে বাড়াতে হবে। কোনো কাজই সম্মানের দিক থেকে ছোটো বা হালকা নয়। কায়িক শ্রম, মেধাগত শ্রম ও পুঁজি সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ— এই বিশ্বাস এবং অনুরূপ আচরণ আমাদের সবাইকে করতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ স্থাপনের প্রবণতাকে উৎসাহিত করতে হবে। প্রতিটি জেলায় কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণের একটি বিকেন্দ্রীকৃত প্রকল্প তৈরি করতে হবে যাতে সেই জেলাতেই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ ইত্যাদি সুবিধা গ্রামে উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে। কিন্তু করোনার বিপত্তির সময়ে কর্মরত কার্যকর্তারাও বুঝতে পেরেছেন যে সমাজের সংগঠিত শক্তিও অনেক কিছু করতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মরত সংস্থা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কিছু সৎ ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষক ও স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা প্রায় ২৭৫টি জেলায় স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সঙ্গে যৌথভাবে এই পরীক্ষাটি শুরু করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা যে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সফল হয়েছে, এমন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

রাষ্ট্রজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সমাজের অংশগ্রহণের এই ধারণা ও আগ্রহ সরকারকে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, বরং রাষ্ট্রের উত্থানে সমাজের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং তার অনুকূল নীতি নির্ধারণের ইঙ্গিত। এটা সত্য যে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বিশাল। জনসংখ্যার বিচার আজকাল দুটি উপায়ে হচ্ছে। এই জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন হবে। যদি এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে, তবে বোঝাও বাড়তে বাড়তে অসহ্য হয়ে উঠবে। সেজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিকটি বিবেচনা করে পরিকল্পনা করা হয়।

জনসংখ্যা বিচারের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো জনসংখ্যাকে একটি সম্পদ রূপে বিবেচনা করা। সেই সম্পদকে সঠিক প্রশিক্ষণ এবং তার সর্বাধিক ব্যবহারের কথা ভাবতে হয়। সারা বিশ্বের জনসংখ্যার দিকে তাকালে একটা বিষয় মাথায় আসে। কেবল আমাদের দেশের দিকে তাকালে চিন্তাভাবনা হয়তো বদলে যেতে পারে। চীন তার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি পরিবর্তন করে তার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করেছে। দেশের স্বার্থ জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিচারধারাকে প্রভাবিত করে। আজ ভারত সবচাইতে তরুণ প্রজন্মের দেশ বলে পরিচিত। পঞ্চাশ বছর পরে আজকের যুব প্রৌঢ়ে পরিণত হবে। দেশের জনগণ তাদের প্রচেষ্টায় দেশকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনই তাদের নিজেদের ও সমাজের জীবিকাও নিরাপদ করে। জনতার যোগক্ষেম এবং জাতীয় পরিচিতি ও নিরাপত্তা ছাড়াও এই কয়েকটি বিষয় স্পর্শ করে।

সন্তানের সংখ্যার বিষয়টি মায়েদের স্বাস্থ্য, আর্থিক সক্ষমতা, শিক্ষা ও ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রতিটি পরিবারের চাহিদার সঙ্গেও সম্পর্কিত। জনসংখ্যা পরিবেশকেও প্রভাবিত করে। মোটকথা, জনসংখ্যা নীতি অনেক কিছুকে সামগ্রিক ও সমন্বিতভাবে বিবেচনা করে প্রণয়ন করতে হবে, সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং জনসচেতনতার মাধ্যমে এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তবেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুন ফলদায়ী হবে।

২০০০ সালে ভারত সরকার সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করেছিল। সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ২.১ প্রজননের হার (TER) লাভ করা। এখন ২০২২ সালে প্রতি পাঁচবছরে প্রকাশিত NFHS রিপোর্ট এসেছে। যেখানে সমাজের সচেতনতা ও ইতিবাচক অংশগ্রহণ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্রমাগত সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে২.১-এর কম উর্বরতার হার প্রায় ২.০-এ নেমে এসেছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের দিকে অগ্রগতির সময় আরও বিবেচনার জন্য দুটি প্রশ্ন উঠছে। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী অতি ক্ষুদ্র পরিবার, ছেলে-মেয়েদের সুস্থ ও সার্বিক বিকাশ, পরিবারে নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক চাপ, একাকিত্ব ইত্যাদির কারণে 'পরিবার ব্যবস্থা' নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

একই সময়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা। ৭৫ বছর আগে আমরা আমাদের দেশে এটি অনুভব করেছি। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের তিনটি সদ্য স্বাধীন দেশের সৃষ্টি— পূর্ব তিমো, দক্ষিণ সুদান ও কসোভা। ইন্দোনেশিয়া, সুদান ও সার্বিয়ার একই ভূভাগে জনবিন্যাসের ভারসাম্যহীনতার ফল এটি। যখনই কোনো

দেশের জনবিন্যাসে ভারসাম্য নষ্ট হয়, তখন সেই দেশের ভৌগোলিক সীমানাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। জন্মহারে বৈষম্যের পাশাপাশি দেশে লোভ-লালসা, জোর করে ধর্মান্তরকরণ ও অনুপ্রবেশও বড়ো কারণ। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে জনসংখ্যার ভারসাম্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা উপেক্ষা করা যায় না।

গণতন্ত্রে জনমানসের সঙ্গে সহযোগিতার গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। নিয়ম তৈরি করা হয়, সেটি গৃহীত হয় এবং সেই থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল তার থেকেই পাওয়া যায়। যে নিয়মগুলির লাভ দ্রুত চোখে পড়ে অথবা যে নিয়মগুলির উপকার সময়ের সঙ্গে চোখে পড়ে সেগুলি ব্যাখ্যা করতে হয় না। কিন্তু যখন দেশের স্বার্থে মানুষকে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, সেখানে এই আত্মত্যাগের জন্য জনগণকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই সমাজে স্ব-এর বোধ ও গৌরব জাগিয়ে রাখা দরকার।

এই 'স্ব' আমাদের সকলকে যুক্ত করে। কারণ এটি আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের দ্বারা প্রাপ্ত সত্য উপলব্ধির প্রত্যক্ষ ফল। 'সর্ব যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্' হলো একই চিরন্তন অবিনাশী উৎপত্তির একটি অভিব্যক্তি। সেজন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজ বিশিষ্টতার ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকের বৈচিত্র্য ও স্বতন্ত্রতাকে সম্মান করা এবং গ্রহণ করা উচিত। কেবল ভারতই সকলকে এই শিক্ষা দিতে সমর্থ। সবাই এক, তাই সবাইকে মিলেমিশে চলতে হবে। বিশ্বাসের বৈচিত্র্য আমাদের আলাদা করে না। সত্য, করুণা, অভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা এবং তপস্যার সারমর্ম সমস্ত বিশ্বাসকে সম্মিলিত করে। সমস্ত বৈচিত্র্যের সুরক্ষা ও অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করে যুক্ত রাখে। এটিই আমাদের সংস্কৃতিতে ধর্ম বলে পরিচিত। এই দু-চারটি উপাদানের ওপর ভিত্তি করে সমগ্র বিশ্বের জীবনকে সমন্বয়, আলাপ-আলোচনা ও সম্প্রীতি দেয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করতে পারার মতো আমাদের সংস্কৃতি সকলকে একত্রিত করে বিশ্বকে একটি পরিবার হিসেবে সংযুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করে। সৃষ্টির পর থেকে আমরা সবাই বেঁচে থাকি, বেড়ে উঠি। 'জীবনে যাবদাদানম্ স্যাৎ প্রদানং ততোধিকম্'-এর ধারণা আমরা এর থেকেই পাই। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর এই অনুভূতি এবং ' বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্'-এর এই মহান লক্ষ্য আমাদের পুরুষার্থ লাভে অনুপ্রাণিত করে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের এই শাশ্বত প্রবাহ সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই উদ্দেশ্যে, এই রীতিতেই চলে আসছে। সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী রূপ, পথ ও শৈলী পরিবর্তিত হলেও মূল ধারণা, গন্তব্য ও উদ্দেশ্য একই রয়ে গেছে। আমরা এই পথে এই অবিরাম গতি অর্জন করেছি অগণিত বীরের সাহস, আত্মবলিদান, অগণিত কর্মযোগীর ভীমবৎ পরিশ্রম এবং জ্ঞানীদের কঠোর তপস্যার দ্বারা। তাঁদের আমরা সবাই আমাদের জীবনে অনুকরণীয় আদর্শের স্থান দিয়েছি। তাঁরা আমাদের সকলের গর্ব। তাঁরা আমাদের মহান পূর্বপুরুষ এবং আমাদের একত্রীকরণের আর একটি ভিত্তি।

তাঁরা সকলেই আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি ভারতের জয়গান গেয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকেই সকল প্রকার বৈচিত্র্যকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা এবং একসঙ্গে চলা আমাদের স্বভাব হয়ে উঠেছে। বস্তুগত আনন্দের চূড়ান্ত সময়ে থেমে না গিয়ে, আমাদের অন্তরের গভীরে খনন করে আমরা অস্তিত্বের সত্যতাকে পেয়েছি। বিশ্বকে নিজের পরিবার মনে করে তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এর কারণ আমাদের মাতৃভূমি ভারত। প্রাচীনকালে সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা এই ভারতমাতা আমাদের যে নিরাপত্তা ও শান্তি দিয়েছিলেন তার ফল চতুর্মুখী এবং তা সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রাকৃতিক উপায়ে। সেই অখণ্ড মাতৃভূমির প্রতি একান্ত ভক্তিই আমাদের রাষ্ট্রীয়তার মূল ভিত্তি।

প্রাচীনকাল থেকেই ভূগোল, ভাষা, উপাসনা পদ্ধতি, জীবনধারা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও সমাজ হিসেবে, সংস্কৃতি হিসেবে, রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের জীবনপ্রবাহ অটুটভাবে চলে আসছে। এর মধ্যে সমস্ত প্রকার বৈচিত্র্যের গ্রহণযোগ্যতা আছে, সম্মান আছে, নিরাপত্তা আছে, উন্নয়ন আছে। নিজের সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, আগ্রাসন ও অহংকার ছাড়া আর কিছু ছাড়তে হয় না। সত্য, করুণা, অন্তর-বাহ্য পবিত্রতা— এই তিনটির অনুশীলন ছাড়া আর কিছুরই অনিবার্য প্রয়োজন নেই। ভারতের ভক্তি, আমাদের পূর্বপুরুষদের উজ্জ্বল আদর্শ এবং ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি– এই তিনটি আলোকস্তম্ভের দ্বারা আলোকিত ও প্রশস্ত পথে প্রেমের সঙ্গে একসঙ্গে হাঁটা, এটি আমাদের 'স্ব'। এটিই আমাদের রাষ্ট্রধর্ম।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দ্বারা সমাজের প্রতি আহ্বানের অভিপ্রায় প্রথম থেকেই এটিই ছিল। বর্তমানের অভিজ্ঞতা হলো, এখন সবাই সেই ডাক শুনতে ও বুঝতে প্রস্তুত। অজ্ঞতা, অসত্য, কুৎসা, ভয় বা স্বার্থপরতার কারণে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রভাব কমে যাচ্ছে। কারণ সঙ্ঘের ব্যাপ্তি এবং সামাজিক আদান-প্রদান অর্থাৎ সঙ্ঘের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীতে মান্যতা পাওয়ার জন্য সত্যকেও শক্তিশালী হতে হয়, এটাই জীবনের অদ্ভুত সত্য। পৃথিবীতে অশুভ শক্তিও আছে, তা এড়াতে এবং অন্যদের বাঁচাতে সজ্জনদের সংগঠিত শক্তি প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রতি প্রেমভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সমগ্র সমাজকে সংগঠিত শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার কাজ সঙ্ঘ করে চলেছে। এটি হিন্দু সংগঠনের কাজ, কারণ উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় ধারণাকে হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণা বলা হয়, আর সেটাই বাস্তব। তাই উপরোক্ত রাষ্ট্র ধারণায় বিশ্বাসী সবাইকে অর্থাৎ হিন্দু সমাজের সংগঠন, হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের সংরক্ষণ করে হিন্দু সমাজের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য সঙ্ঘ 'সবেষাম্ অবিরোধেন' করে চলেছে।

এখন যখন সঙ্ঘ সমাজে কিছুটা স্নেহ ও বিশ্বাস অর্জন করেছে এবং তার শক্তিও রয়েছে, তখন লোকেরা হিন্দুরাষ্ট্রের কথা

গুরুত্ব সহকারে শোনে। এই অভিপ্রায়টিকে মাথায় রেখেই কেবল 'হিন্দু' শব্দের বিরোধিতা করে অন্য শব্দের ব্যবহার করছেন অনেকে। তাদের বিষয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। অভিপ্রায়ের স্পষ্টতার জন্য আমরা আমাদের জন্য **হিন্দু** শব্দের ওপর জোর দিতে থাকব।

তথাকথিত সংখ্যালঘুদের মধ্যে অকারণে একটা ভয় তৈরি করা হয় যে আমাদের অর্থাৎ সংগঠিত হিন্দুদের হাতে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। এমনটা কখনোও হয়নি এবং হবেও না। সঙ্ঘের এমন স্বভাব নয় এবং ইতিহাসও নেই। অন্যায়, অত্যাচার, বিদ্বেষের আশ্রয় নিয়ে সমাজে গুন্ডামি করা লোকেরা সমাজের সঙ্গে শত্রুতা করলে আত্মরক্ষা বা আপ্তরক্ষা করা সবার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। 'ন ভয় দেত কাহু, ন ভয় জানত আপ'-এর মতো হিন্দু সমাজকে দাঁড় করানো সময়ের দাবি। এটা কারও বিরুদ্ধে নয়। সঙ্ঘ দৃঢ়ভাবে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভদ্রতা ও শান্তির পক্ষে দণ্ডায়মান।

এই ধরনের উদ্বেগ মাথায় রেখে তথাকথিত সংখ্যালঘুদের কিছু ভদ্রলোক গত কয়েকবছর ধরে দেখা করতে আসছেন। সঙ্ঘের কয়েকজন কার্যকর্তার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়েছে এবং তা হতেই থাকবে। ভারত একটি প্রাচীন রাষ্ট্র এবং এক রাষ্ট্র। সেই পরিচয় ও স্রোতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আসুন আমরা সবাই ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও শান্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের নিঃস্বার্থ সেবা করি। সুখে-দুঃখে পরস্পরের সঙ্গী হই। ভারতকে জানি, ভারতকে বিশ্বাস করি, ভারতের জন্য তৈরি হই— এমনই একাত্ম ও অভিন্ন রাষ্ট্রের কল্পনা সঙ্ঘ করে। এতে সঙ্ঘের অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা আগ্রহ নেই।

কিছুদিন আগে রাজস্থানের উদয়পুরে একটি জঘন্য ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। পুরো সমাজ হতবাক। সমাজের বৃহত্তর অংশ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে। গোটা সমাজ এই ধরনের ঘটনার মূলে জড়িত থাকে না। উদয়পুরের ঘটনার পর মুসলমান সমাজের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিও বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিরোধিতা ব্যতিক্রম হয়েই থেকে যাওয়া উচিত নয়, বরং এই প্রবৃত্তি বৃহত্তর মুসলমান সমাজের স্বভাবে পরিণত হওয়া উচিত। হিন্দু সমাজের কেউ এরকম ঘটনা ঘটালে, তাকে অভিযুক্ত করা হলেও, তার বিরোধিতা ও নিন্দা সম্পূর্ণ সমাজ মুখরভাবে করে থাকে।

উসকানি যেমনই হোক, যেখান থেকেই হোক না কেন, আইন ও সংবিধানের মর্যাদার মধ্যে থেকে সকলকে সর্বদা নিজের বিরোধ প্রকাশ করা উচিত। সমাজ সংগঠিত হোক, যেন না ভাঙে, ঝগড়া না করে, বিচ্ছিন্ন না হয়। মন-বচন-কর্মের মাধ্যমে এমনই ভাব মনে রেখে সমাজের সজ্জনদের মুখর হতে হবে। আমরা দেখতে আলাদা এবং বিশিষ্ট বলে আলাদা, আমাদের বিচ্ছেদ দরকার, আমরা এই দেশ ও তার মূল জীবনধারা এবং পরিচয় নিয়ে চলতে পারি না— এই অসত্যের কারণে ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ হয়েছে, দেশ খণ্ডিত হয়েছে, মন্দির ধ্বংস হয়েছে। এই বিষাক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা কেউ সুখী হইনি। আমরা ভারতের, ভারতীয় পূর্বপুরুষের, ভারতের চিরন্তন (সনাতন) সংস্কৃতির সমাজ ও রাষ্ট্রীয়তা হিসেবে এক—এটাই আমাদের উদ্ধারক মন্ত্র।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় উত্থানের শুরুতে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ভারতমাতাকেই একমাত্র আরাধ্যারূপে মেনে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঋষি অরবিন্দ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, প্রথম স্বাধীনতা দিবসে এবং তাঁর নিজের জন্মদিনে দেশবাসীকে একটি বার্তা দিয়েছিলেন। এতে তাঁর পাঁচটি স্বপ্নের উল্লেখ রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্যের ভাবনা সেখানে প্রথম ছিল। সাংবিধানিক পদ্ধতিতে রাজ্যগুলিকে একীভূত করার বিষয়ে তিনি এক অখণ্ড ভারত গঠনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু দেশভাগের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের পরিবর্তে এক চিরন্তন রাজনৈতিক ব্যবধান তৈরি হয়েছে যা ভারতের ঐক্য, অগ্রগতি ও শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেজন্য তাঁর চিন্তা ছিল। যেভাবেই হোক না কেন, বিভাজন রদ হওয়ার পর ভারত যেন এক হয়, এরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিনি প্রকাশ করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে তাঁর পরবর্তী সমস্ত স্বপ্নের — এশিয়ার দেশগুলির মুক্তি, বিশ্বের একতা, ভারতের আধ্যাত্মিকতার জন্য বিশ্বব্যাপী অভিমন্ত্রণ এবং বিশ্বে অতিমানসের জগতে অবতরণের ও বাস্তবায়নের ফলে ভারতই প্রাধান্য পাবে। তিনি জানতেন যে এটি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রাধিকার থাকবে। তাই তাঁর কর্তব্য বার্তা খুবই স্পষ্ট— ''রাষ্ট্রের ইতিহাসে এমন একটি সময় আসে যখন ভাগ্য তার সামনে একটিই কাজ একটিই লক্ষ্য রাখে, যার জন্য অন্য সবকিছু, তা সে যতই উন্নত বা উদাত্ত হোক না কেন, সব কিছুই সমর্পণ করতে হয়। আমাদের মাতৃভূমির জন্য এখন এমন এক সময় এসেছে, যখন তাঁর সেবার চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই। যখন অন্য সবকিছু তাঁরই জন্য সম্পাদন করতে হয়। আপনি যদি অধ্যয়ন করেন, তবে তাঁরই জন্য অধ্যয়ন করুন। আপনার দেহ, মন ও আত্মাকে তাঁর সেবা করার জন্য প্রশিক্ষণ দিন। দেশের জন্য বাঁচার লক্ষ্যেই নিজের জীবিকা অর্জন করুন। আপনি সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশে যাবেন, যাতে সেখান থেকে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর সেবা করতে পারেন। তাঁর গৌরবের জন্য কাজ করুন। তিনি যাতে আনন্দে থাকেন, তারজন্য আপনি দুঃখ সহ্য করুন। এই একটি উ পমহাদেশে সবকিছু এসে গেছে।'' ভারতের জনগণের জন্য আজও এটি একটি অর্থবহ বার্তা।

গ্রামে গ্রামে সজ্জন শক্তি। প্রতি লোমকূপে ভারত ভক্তি।

এটিই বিজয়ের মহামন্ত্র। দশদিকে করো বিস্তার।

জয় হোক জয় হোক আমার দেশের গৌরব।

।। ভারতমাতা কী জয়।।

(নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতজীর বিজয়াদশমী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ)

মধ্যপ্রাচ্যের ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে তৈরি ভারত

দিব্যেন্দু বটব্যাল

ওপেক (অরগানাইজেশন অব দি পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির এখনকার অবস্থা পুরনো একটি বাংলা প্রবাদের সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে যায়--- অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোটো হয়ো না ছাগলে মুড়িয়ে খাবে। ওপেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশ বলতে সাধারণভাবে মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশগুলিকে বোঝায়। আমেরিকা ও রাশিয়াতেও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় কিন্তু তারা ওপেক গোষ্ঠীভুক্ত নয়। এখন ওপেকের সদস্য এগারোটি দেশ--- আলজিরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, ইকুয়েটোরিয়াল গিনিয়া, গ্যাবন, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, দি রিপাবলিক অব কঙ্গো, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ভেনেজুয়েলা। এইসব দেশের সবকটিই যে মধ্যপ্রাচ্যের, তা নয়। কিন্তু ভারতের সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যের ওপেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে নিয়ে। বিশেষ করে সৌদি আরব ও কুয়েত। এক সময় ভারত মোট প্রয়োজনের পঁচাশি শতাংশ পেট্রোলিয়াম সৌদি আরব থেকে আমদানি করত। বলা যেতে পারে একেবারে অন্ধের মতো নির্ভর করত সৌদি আরবের ওপর। মোটা মুনাফা অর্জনের এমন একটি সোনার সুযোগ হাতছাড়া করেনি সৌদি। বহুবার কার্যত ভারতকে ব্ল্যাকমেল করে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভারতের পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েছে। সেই সুবাদে দাম বেড়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেরও।

এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খোঁজার জন্যেই আমেরিকার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম (ক্রুড অয়েল) কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা ঠিক যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর আমেরিকার লাগানো স্যাংশনকে ব্যর্থ করে দিতে রাশিয়া সেই সময় ভারতকে পেট্রোপণ্যের কেনাকাটায় ভালো রকম ছাড় দিয়েছিল। এটাও ঠিক, ৩০ শতাংশ ছাড়ে (এখন অবশ্য ছাড় এতটা নয়) অপরিশোধিত তেল কেনার ফলে ভারত ৩৫,০০০ কোটি টাকা লাভ করেছে। এবং সৌদি আরব-সহ মধ্যপ্রাচ্যের ওপেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে উচিত শিক্ষা দিতে পেরেছে। কিন্তু এসব হয়েছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। যুদ্ধও চিরকাল চলবে না আর যুদ্ধের ফলে তৈরি হওয়া ভূ-রাজনৈতিক টানাপড়েনও বেশিদিন থাকবে না। সুতরাং মধ্য এশিয়ার দাদাগিরির জবাব দিতে হলে অন্য কিছু ভাবা দরকার। সেই ব্যবস্থাই করেছে ভারত। মোদী সরকার ওপেক ধাঁচের একটি সংগঠন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর তাতেই চোখ কপালে উঠে গেছে মধ্য এশিয়ার।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতে যেখানে খনিজ তেল বেশি পাওয়াই যায় না সেখানে কীসের ভরসায় মোদী সরকার এমন একটি সিদ্ধান্ত নিল? মোদী সরকারের এই পরিকল্পনা খনিজ পেট্রোলিয়ামের ওপর ভিত্তি করে নয়, এই পরিকল্পনার ভিত্তি বায়োফুয়েল। কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য সারা বিশ্বে পেট্রোলিয়ামের বিকল্প খোঁজা অনেকদিন ধরে শুরু হয়েছে। বায়োফুয়েল এরকমই এক বিকল্প। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতও বায়োফুয়েল উৎপাদনে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। যে কারণে আগামী বছর সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য জি-২০ সামিটে অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয় হতে চলেছে বায়োফুয়েল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমেরিকা, ব্রাজিল, আরজেন্টিনা ইন্দোনেশিয়া ও চীনও বায়োফুয়েল উৎপাদনে সক্ষম। এবং এইসব দেশ জি-২০-র সদস্য। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে বায়োফুয়েল নিয়ে ভারত যথেষ্ট সিরিয়াস। বায়োফুয়েল উৎপাদনে স্বনির্ভর হলে শুধু যে পরিবেশ দূষণ কম হবে বা পেট্রোল-ডিজেলের ওপর নির্ভরতা কমবে, তাই নয়— নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে ভারত রপ্তানিও করতে পারবে। সেই জন্যেই ভারত ওপেক ধাঁচের সংগঠন গড়ে বায়োফুয়েল নিয়ে বাণিজ্যের পথটি এখন থেকে সুগম করতে চায়।

চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে জি-২০ প্রেসিডেন্সি অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'জি-২০ প্রেসিডেন্সিতে আমরা বায়োফুয়েল উৎপাদনে অগ্রসর দেশের সঙ্গে যৌথ আদান-প্রদানের ব্যাপারটি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই। বায়োফুয়েল উৎপাদনে অগ্রগণ্য বিশ্বের প্রতিটি দেশই জি-২০-র সদস্য। সুতরাং আলোচনার জায়গা থেকে যাচ্ছে।' পার্টনার হিসেবে ভারতের প্রথম পছন্দ আমেরিকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। আধিকারিক জানিয়েছেন, আপাতত দুই দেশ বায়োফুয়েল উৎপাদন-সংক্রান্ত তথ্য ও প্রযুক্তি বিনিময়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেবে। আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে ২ জি ও ৩ জি বায়োফুয়েল সংক্রান্ত মত বিনিময়। এখনই বাণিজ্য নিয়ে কোনও কথা হবে না।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রজন্মের বায়োফুয়েল বিশদে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথম প্রজন্মের (First Generation বা ১ জি) বায়োফুয়েল প্রধানত তৈরি করা হয় চিনি, ভুট্টা, গম ও ভাঙা চাল থেকে। দ্বিতীয় প্রজন্মের (২ জি) বায়োফুয়েল উৎপাদনের প্রধান উপাদান নানা ধরনের নন-ফুড বায়োমাস, যেমন উদ্ভিজ্জ উপাদান ও প্রাণীজ বর্জ্য। আবার তৃতীয় প্রজন্মের (৩ জি) বায়োফুয়েল তৈরি হয় মাইক্রোঅর্গানিজম থেকে— অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও অ্যালগি থেকে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের কাছে দেশ সবার আগে। বিদেশনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সরকারের এই মানসিকতার প্রতিফলন আমরা দেখেছি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর রাশিয়ার কাছ থেকে ভারতের ক্রুড অয়েল কেনার বিরোধিতা করেছিল সারা বিশ্ব। কিন্তু সরকার দেশের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সেসবের তোয়াক্কা করেনি। একই ধরনের ঘটনা আমরা পাম অয়েল কেনার ক্ষেত্রেও দেখেছি। ভারত তার মোট প্রয়োজনের ৮৫ শতাংশ পাম অয়েল ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে কিনত। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া তাদের নিজের দেশে পাম অয়েলের দাম বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে রপ্তানি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সুযোগটা লুফে নেয় মালয়েশিয়া। তারা প্রায় পঁচিশ শতাংশ ডিসকাউন্টে ভারতকে পাম অয়েল বিক্রি করার প্রস্তাব দেয়। এখন ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর পাম অয়েল জমে গেছে। তারা চাইছে ভারত আবার আগের মতো তাদের কাছ থেকে পাম অয়েল কিনুক। ভারত তাদের নিরাশ না করে বলেছে, কিনব। কিন্তু মালয়েশিয়া যে দামে দিচ্ছে সেই দামে দিতে হবে। এই হচ্ছে আজকের ভারত। এই ভারত শক্তিধর দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর পিছনে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। ইন্ডিয়া ফার্স্ট পলিসি অনুযায়ী যা করা উচিত সেটাই করে। বায়োফুয়েল পলিসিতেও মোদী সরকার একইরকম অনমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই ব্রাজিলের সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি হয়েছে। এবং চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ব্রাজিলের শক্তিমন্ত্রী বেন্টো আলবুকোয়ার্ক ভারতে এসে পেট্রোলিয়াম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরীর সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। আপাতত ঠিক হয়েছে ব্রিকস মিনিস্টেরিয়াল অনুযায়ী দুই দেশ পরিবেশ ও জৈবশক্তি ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করবে। এই পরিকল্পনা এমন সময়ে করা হচ্ছে যখন ভারত জ্বালানিক্ষেত্রে স্বনির্ভর হবার কথা ভাবছে আর সারা বিশ্ব রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্যত জ্বালানি সংকটের দিকে এগোচ্ছে। বিশ্বের ৮৫ শতাংশ দেশকে জ্বালানি আমদানি করতে হয়। এই অবস্থায় ইউরোপ-সহ পশ্চিমি দেশগুলির জ্বালানি সংকট যদি দিনে-দিনে আরও বাড়ে তাহলে তার প্রভাব যে ভারতেও পড়বে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সারা বিশ্বের পরিস্থিতির কথা বিচার করলে বায়োফুয়েল উৎপাদনে ভারতের স্বনির্ভর হওয়ার এবং ওপেক ধাঁচের সংগঠন গড়ার মাধ্যমে বিপণনের ব্যবস্থা আগেভাগে তৈরি করার সিদ্ধান্ত যথেষ্টই সময়োপযোগী।

এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপট তৈরির কাজ যদিও ভারত অনেকদিন ধরেই করছে। বায়োফুয়েলের অন্যতম প্রধান একটি উপাদান ইথানল। মোদী সরকারের বায়োফুয়েল পলিসি অনুযায়ী ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে প্রতি লিটার পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশিয়ে বাজারে ছাড়ার কাজ শেষ হয়ে যাবে। এর আগে ২০৩০ ছিল এই পরিকল্পনা রূপায়ণের সর্বোচ্চ সময়সীমা। পরে পাঁচ বছর কমানো হয়। চলতি বছরের জুনেই প্রতি লিটার পেট্রোলে ১০ শতাংশ ইথানল মেশানোর লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে। ইথানল মেশানো পেট্রোল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি আগের থেকে কমে যাবে। এর ফলে বেঁচে যাবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। মোদী সরকার ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় প্রজন্মের (২ জি) বায়োফুয়েল শোধনাগারগুলির জন্য ৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া দেওয়া হয়েছে করছাড় এবং ১ জি বায়োফুয়েলের তুলনায় দামে সুবিধা। নন-এডিবল তৈলবীজ থেকে বায়োডিজেল তৈরিরর পক্ষে জোরদার সুপারিশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে বায়োডিজেলের জন্য একটি বিপণন-শৃঙ্খল গড়ে তোলার ওপরেও জোর দিচ্ছে ভারত সরকার।

একথা ঠিক, এই মুহূর্তে ভারত যে পরিমাণ ইথানল ও বায়োডিজেল তৈরি করছে তা এত বড়ো দেশের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে বায়োফুয়েল উৎপাদনে সক্ষম কোনও দেশ যদি ভারতের পার্টনার হয় তাহলে তা হবে ভবিষ্যতের জ্বালানি সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল রূপরেখা। কারণ একা কেউ উন্নতি করতে পারে না— এই প্রবাদ মেনে নিলে বায়োফুয়েল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রতিটি দেশকে এখন সহযোগিতামূলক নীতি নিয়ে চলতে হবে। ভারত ঠিক সময়ে কথাটা বুঝেছে। এখন শুধু এটাই দেখার ভারত ঠিক কতদিনে বায়োফুয়েল উৎপাদনে আত্মনির্ভর হয় আর মধ্যপ্রাচ্যের ঔদ্ধত্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। □

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

বদলে যাচ্ছে ভারতীয় সিনেমা

রক্তিম দাশ

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক সময় থেকেই সংস্কৃতি চর্চা ও বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে সিনেমা নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায়। সেই সময় থেকেই সংবাদপত্র ও বেতারের পাশাপাশি সিনেমা একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দেশের সিনেমা নির্মাণের শুরুর দিক থেকেই নির্বাক মাধ্যমে মূলত সনাতন হিন্দু ধর্মীয় কাহিনি তুলে ধরা হয়। ১৯১৩ সালে প্রদর্শিত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে প্রথম সিনেমা 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' নির্মাণ করেছিলেন দাদা সাহেব ফালকে, তা ছিল ধর্মীয় কাহিনির ওপর ভিত্তি করে। এই চলচ্চিত্র নির্মাণের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি ১৯১৮ সালে 'শ্রীকৃষ্ণ জন্ম' নামক আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। যার বিষয় ছিল ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম'কে ঘিরে গড়ে ওঠা কাহিনি। আবহমানকাল ধরে চলে আসা ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় প্রভাবই তাঁকে উৎসাহিত করেছিল এ ধরনের সিনেমা নির্মাণের কাজে। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' সিনেমায় মূল চরিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যবাদিতা পরবর্তীতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং প্রতিপক্ষকে জয় করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন দাদাসাহেব ফালকে।

গল্পটা এরকম : সস্ত্রীক ছবি দেখতে গিয়েছিলেন দাদাসাহেব ফালকে। ছবির নাম 'লাইফ অব ক্রাইস্ট'। এই ছবি দেখেই দাদাসাহেবের প্রথম মনে হয়েছিল আমাদের দেশের পুরাণের উপর নির্ভর করে এমন ছবি তৈরি হয় না কেন? আমাদের দেশের দর্শক কেন পাশ্চাত্যমুখী? দাদাসাহেবের মাথায় যখন এইসব সমীকরণ চলছে, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, 'ওঁরা পর্দায় এসব তৈরি করেন কী করে?' দাদাসাহেবের মুখ দিয়ে হঠাৎ দৈববাণীর মতো নিঃসৃত হলো, 'তুমি আস্তে আস্তে সব জানতে পারবে। আমিই এমন ছবি তৈরি করব।' দাদাসাহেব অনুভব করতে পেরেছিলেন, যিশু খ্রিস্টের জন্ম যদি শিল্পের বিষয় হতে পারে, তাহলে ভারতের পুরাণের কোনও কোনও অংশও অবশ্যই ছবির বিষয় হতে পারে। সেদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় ছবি কিন্তু প্রথম থেকেই রাজনৈতিক।

মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক হিন্দুজাতিকে পুনরুত্থানের যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তার সঙ্গে দাদাসাহেব যে কাহিনিটিকে তাঁর প্রথম ছবির জন্য নির্বাচন করেছিলেন, তার কোথায় যেন মিল রয়েছে। অর্থাৎ হিন্দু নায়কদের জাতীয় বীর হিসেবে তুলে ধরা। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' নয় তারপর যে ছবিগুলি তিনি তৈরি করেছিলেন 'মোহিনী ভস্মাসুর', 'সত্যবান সাবিত্রী', 'লঙ্কাদহন', 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম', 'কালীয়ামর্দন' সেগুলিও ছিল ভারতীয় ধর্মীয় আখ্যান অবলম্বনে নির্মিত। এগুলিই ভারতের জাতীয় সিনেমার ভিত্তিভূমি তৈরি করে। তাঁর এ ধরনের সিনেমা নির্মাণ এটাই প্রমাণ করে, তিনি দেশের সঠিক ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ফালকে তাঁর সিনেমা নির্মাণের মধ্য দিয়ে সুপ্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন ঔপনিবেশিক আমলেই। একই ভাবে ওই সময়কাল ও পরবর্তীতে নির্মিত বাংলা সিনেমাগুলি জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিল্বমঙ্গল (১৯১৯) ও জয়দেব (১৯২৬), প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী (১৯২৭), দেবকী বসুর চণ্ডীদাস, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সীতা (১৯৩৩), প্রোমাঙ্কুর আতর্থীর কপালকুণ্ডলা (১৯৩৩) ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয়বোধের ওপর নির্মিত হয়।

দেশভাগের মধ্য দিয়ে ভারতে এল স্বাধীনতা। এই সময়কাল থেকে বলিউড কেন্দ্রিক সিনেমা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সময়কালে বলিউড-সহ ভারতের সিনেমা শিল্প চলে যায় কমিউনিস্ট ও তথাকথিত সেকুলার চিন্তাধারার পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সংগীত পরিচালক ও অভিনেতাদের দখলে। কংগ্রেস আর বামপন্থী আদর্শকে ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ আর সমাজতন্ত্র গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে একের পর এক সিনেমা নির্মিত হতে থাকে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের কালখণ্ডে তৈরি হয় নার্গিস-সুনীল দত্ত অভিনীত 'মাদার ইন্ডিয়া', রাজ কাপুরের 'আওয়ারা', দিলীপ কুমারের 'নয়া দৌড়' ও 'লিডার', বিমল রায়ের 'দো বিঘা জমিন', মনোজ কুমারের 'উপকার' তাদের মধ্যে অন্যতম। এই সময় থেকে মুঘল প্রীতি দেখা দেয় বলিউডে। 'আনারকলি', 'মোগল-ই-আজম',

তৈরি হয়। এই সিনেমাগুলির মাধ্যমে ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা হলেও ঐতিহাসিক সত্যতা দেখা যায়নি। বরঞ্চ এর মধ্য দিয়ে মুঘল যুগকে গৌরবান্বিত করা প্রয়াস শুরু হয়। যে প্রয়াস আজও অব্যাহত। এরই মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল '৬২ সালের চীনা আক্রমণের সময় মুক্তি পাওয়া চেতন আনন্দের 'হকিকত'। সিনেমাটি দেশের যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

সত্তরের দশকে দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা বদলে দেয় বলিউড-সহ ভারতীয় সিনেমাকে। ব্যক্তি কেন্দ্রিক, অ্যাংরিম্যান ইমেজ সম্পন্ন হিরোদের মুখ্য করে নির্মিত হতে থাকে সিনেমা। এই সময়কালে সিনেমাগুলিতে হিরোদের দিয়ে একই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী চিন্তাধারা ও দুর্নীতি, অপরাধ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামের কথা বলা হতে থাকে। দিলীপ কুমারের 'গঙ্গা যমুনা', মনোজ কুমারের 'রোটি, কাপড়া অউর মকান';, অমিতাভ বচ্চনের 'দিওয়ার' এবং ওম পুরির 'অর্ধসত্য' ও 'আক্রোশ' সেই সময় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়।

নব্বইরের দশকে এসে এই হিসেব হঠাৎই বদলে যায়। পাকিস্তান ও চীনের প্রবল ভারত বিরোধিতা বলিউডকে ধাক্কা দেয়। প্রেম ও সামাজিক গল্পগুলোর বাইরে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ নিয়ে কিছু পরিচালক সিনেমা নির্মাণ শুরু করেন। বেশ কিছু সিনেমা দেশজুড়ে দর্শকের মনে ব্যাপক সাড়া ফেলে। 'গদর; এক প্রেম কথা' সিনেমায় সানি দেওলের বিখ্যাত হ্যান্ড পাম্প ওঠানোর দৃশ্যটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। এই সময় পরিচালক জে পি দত্তার 'বর্ডার', 'এলওসি কারগিল'-এর মতো যুদ্ধের সিনেমা জনপ্রিয়তা পায়। জঙ্গি সমস্যার ওপর ছবি 'রোজা', 'বম্বে', 'দিল সে', 'ফিজা' ও 'মিশন কাশ্মীর' দর্শক পছন্দের প্রথম সারিতে চলে আসে।

২০০০ সালের পর থেকে ভারতীয় সিনেমা প্রবল ভাবে নিজের শিকড়ে ফিরে আসার চেষ্টা শুরু করে। এসময় 'স্বদেশ' ও রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহতার ২০১৬ সালের ছবি 'রং দে বসন্তী'-তে তুলে ধরা হয়েছে দেশের নব প্রজন্মের দেশপ্রেম নিয়ে নতুন চিন্তাকে। 'চক দে ইন্ডিয়া' ও 'লগান'-খেলার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম ও অনুপ্রেরণার মিশেল সকলের মন জয় করে। কিন্তু এরমধ্যে কুপ্রথার বিরোধিতা করতে গিয়ে আমির খানের 'পিকে' দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় আবেগকে আঘাত করে বির্তকের জন্ম দেয়। কিন্তু এরই মধ্যে বিশেষ করে মহিলাদের সমস্যা তুলে ধরে স্বাস্থ্য সচেতনতার কথা বলা অক্ষয় কুমারের দুটি সিনেমা— 'প্যাডম্যান' ও 'টয়লেট; এক প্রেম কথা' সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়। ভিকি কৌশলের 'উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'ও দেশপ্রেমের চেতনাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। 'বাদশাহো', 'ইন্দু সরকার', 'উরি', 'রাজি', 'দ্য গাজি অ্যাটাক', 'পরমাণু : দ্য স্টোরি অব পোখরান', 'দ্য অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার', 'ঠাকরে'-র মতো সিনেমাগুলোয় বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনার সাহসী চিত্রনাট্য হিসেবে মুক্তি পায় সেলুলয়েডে। ২০১৪ সালে 'বাজিরাও মাস্তনি' মুক্তি পায়। ছবিটিতে মারাঠাদের সাহসিকতা তুলে ধরা হয়, দাক্ষিণাত্যের নিজাম ও দিল্লির মোগলদের বিরুদ্ধে তাদের বীরত্ব তুলে ধরা হয়। 'তাসখন্দ ফাইল' সিনেমাটির মধ্যে দিয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্যকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

একটা সময় বলিউড নিজেদের শেকড় ভুলে মেতেছিল পাশ্চাত্য নিয়ে। অন্যদিকে, দক্ষিণ ভারতের সিনেমাগুলি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার গল্প নিয়ে সিনেমা তৈরি করে যাচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের ঐতিহ্যবাহী সভ্যতাকে চিত্রিত করা দক্ষিণের সিনেমার ইউএসপি। যা এখন বলিউড-সহ দেশীয় অন্য ভাষার সিনেমা নির্মাণে প্রভাব ফেলছে।

সম্প্রতি বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' মুক্তি পেয়েছে। ৯০-এর দশকের শুরুর দিকে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা তাঁদের মাতৃভূমি থেকে কীভাবে বিতাড়িত হয়েছিলেন তাই ক্যামেরা বন্দি করেছেন পরিচালক। মুক্তি পাওয়ার মাত্র আট দিনের মধ্যে ১০০ কোটি টাকা আয় করে এই ছবি রীতিমতো সাড়া ফেলে দেয়। একইভাবে দক্ষিণ ভারতের পরিচালক এস এস রাজামৌলি পরিচালিত 'আরআরআর' মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তোলে। আয়ের নিরিখে সর্বকালের সেরা ভারতীয় সিনেমার তালিকায় ইতিমধ্যেই স্থান পেয়েছে 'আরআরআর'। একসঙ্গে পাঁচটি ভারতীয় ভাষায় মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি আলুরি সীতারাম রাজু এবং কোমারাম ভীমের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। এরা দুজনেই প্রতিবাদী, জনজাতিদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করেছিলেন আবার পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এতদিনের উপেক্ষিত জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, হিন্দুত্ব, ঐতিহাসিক হিন্দু বীরদের তুলে ধরা এখন বলিউডের নয়া ট্রেন্ড। একইভাবে মারাঠি সিনেমায় এর প্রভাব পড়েছে। মারাঠি পরিচালক দিগপাল লানজেকরের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক সিনেমা সর্বশেষ পবনখিন্দ এর উদাহরণ। অভিজিৎ দেশপাণ্ডে পরিচালিত আসন্ন মারাঠি ছবি 'হর হর মহাদেব'-এর টিজারে ছত্রপতি শিবাজীকে রাজা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আদিপুরুষ শ্রীরাম ও রামায়ণের ওপর নির্মিত, ওম রাউত পরিচালিত ৫০০ কোটির মেগা বাজেটের সিনেমা ২০২৩ সালে মুক্তি পাবে অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দির উদ্বোধনের বছরে।

এদিকে, ভারতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে আঘাত করে এমন সিনেমার বিরুদ্ধে এখন প্রকাশ্যে বয়কটের আওয়াজ তুলছেন সাধারণ দর্শকরা। যার ফলে বিগ বাজেটে গড়া আমির খানের 'লাল সিং চাড্ডা'র মতো সিনেমাও বয়কটের ডাকে মুখ থুবড়ে পড়ে বক্স অফিসে। শাহরুখ খানের 'পাঠান' সিনেমাটিতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগে এখন বয়কটের কবলে। দেশজুড়ে সামাজিক মাধ্যমে বয়কটের দাবিতে তীব্র জনমত সংগঠিত হচ্ছে। বয়কটের আওয়াজ এবার টলিউডের বাংলা সিনেমা 'ধর্মযুদ্ধ' এবং ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সিনেমা 'বিসমিল্লা' সিনেমাকে নিয়ে একটি পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ''টলিউড যখন বলছে 'বলতেই হবে বিসমিল্লা'', দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা জগৎ তখন বলছে, 'বন্দেমাতরম্!' বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালি, বিবেকানন্দের বাঙ্গালি, রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালি, সুভাষচন্দ্রের বাঙ্গালি, অরবিন্দের বাঙ্গালি, এক হাতে গীতা আর এক হাতে তরোয়াল নিয়ে স্বাধীনতার শপথ নেওয়া বাঙ্গালি, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালি! বলে কিনা 'বলতেই হবে বিসমিল্লা!' অন্যদিকে, বয়কটের ভয়ে বলিউডে করণ জোহারের 'তখ্ত', সঞ্জয় লীলা বনশালির সালমান খান এবং আলিয়া ভাটের নির্মিত 'ইনশাল্লা', রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট অভিনীত 'ব্রহ্মাস্ত্র' এখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মুক্তি চেষ্টা চলছে।

(লেখক একজন সাংবাদিক)

সেবা ও সমর্পণ ভাবনার অগ্রপথিক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

বিনয়ভূষণ দাশ

'চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরণ বৈ মধু বিন্দতি'--- উপনিষদের এই বাণীকে আপ্তবাক্য করে সারা জীবন তিনি সমাজের জন্য কাজ করে জীবনদান করেছেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের ধনকিয়া গ্রামে মাতামহ চুনিলাল শুক্লার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি বাড়ি সংযুক্ত প্রদেশের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) মথুরা জেলার নাগলা চন্দ্রবন গ্রামে। বর্তমানে গ্রামটির নাম দীনদয়াল ধাম। তাঁর পিতার নাম ভগবতীপ্রসাদ উপাধ্যায় এবং মাতার নাম রামপ্যারী উপাধ্যায়। তিনি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি মুঘলসরাই স্টেশনে রহস্যজনক ভাবে মারা যান। তাঁর জীবৎকাল মাত্রই বাহান্ন বছর। এই জীবৎকালে তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের গানের কথা—'পথে চলা, সেইতো তোমায় পাওয়া' বাণীকে স্মরণ করেই পথ চলেছেন। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশোনা করেছেন তাঁর মামার কাছে থেকে। নানাজী দেশমুখ ও শ্রীভাউ জুগাড়ের প্রভাব ও অনুপ্রেরণায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে যোগদান করেন। বিক্রমজিৎ সিংহ সনাতন ধর্ম কলেজে অধ্যয়ন করার সময়েই তাঁর সহপাঠী বালুজী মহাশব্দের মাধ্যমে সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তিনি কানপুরের সনাতন ধর্ম কলেজ থেকে গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক হন। এই কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন পরবর্তীকালে জনসঙ্ঘের নেতা সুন্দরসিংহ ভাণ্ডারী। স্নাতকস্তরের পাঠ শেষে তিনি আগ্রার সেন্ট জন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ-তে ভর্তি হন এবং প্রথম বর্ষ উত্তীর্ণ হন।

কিন্তু তিনি তাঁর পড়াশোনা সমাপ্ত করার আগেই ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মাধ্যমে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেন এবং সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে নিজেকে নিয়োগ করেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর জেলার জেলা প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর জীবন হলো আদর্শবাদের সঙ্গে সরল জীবনযাপনের এক অপূর্ব মিশেল। তাঁর সংস্পর্শে যিনিই আসতেন তাঁকে তিনি তাঁর অপূর্ব স্নেহস্পর্শে প্রভাবিত করতে পারতেন। তাঁর সরল জীবনযাপন এবং আদর্শবাদের প্রতি নিষ্ঠা তাঁর প্রচারক জীবনের শুরু থেকেই পাওয়া যায়। লখিমপুর জেলা প্রচারক থাকাকালীন তিনি সকলের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক তৈরি করেন এবং স্থানীয় একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাম্মানিক শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ছাত্রদের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন

এবং অন্যান্য শিক্ষক ও পরিচালক সমিতির সকলে এত প্রভাবিত হয়েছিল যে প্রধান শিক্ষকের অবসর নেবার পর তাঁকেই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেবার কথা ভাবা হলো। কিন্তু তখন তাঁকে এই ব্যাপারে আগ্রহী দেখা গেল না। বিদ্যালয় সমিতি ভাবল যে হয়তো তাঁর শুরুর বেতন যথেষ্ট নয় বলে তিনি আগ্রহ দেখাননি। তাঁরা তাঁকে অতিরিক্ত তিনটি বা চারটি ইনক্রিমেন্ট দিতে চাইলেন।

এর উত্তরে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বললেন, 'আমার প্রয়োজন মাত্র দুটো ধুতি, দুটো পাঞ্জাবি আর দুবেলা দুটো করে রুটি। আর এজন্য আমার ত্রিশ টাকার বেশি প্রয়োজন নেই। আপনারা যে অর্থ দিতে চাইছেন তা দিয়ে আমি কী করব?' এটা তাঁর সরল জীবনযাপন ও আদর্শনিষ্ঠার জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁর কর্মনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে সঙ্ঘ কার্যকর্তারা ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে উত্তরপ্রদেশের সহ প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি এই কাজ কয়েক বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে উত্তরপ্রদেশে সঙ্ঘকাজের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য সংগঠক, একজন চিন্তাবিদ এবং একজন লেখক। তিনি চন্দ্রগুপ্ত নাটক এবং আদি শঙ্করাচার্যের জীবনী অবলম্বনে দুটি জনপ্রিয় বই লেখেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভাষণে প্রায়শ বলতেন, 'Like the gentle morning dew, which falls unseen and unheard, and yet bringing into blossom the fairest of roses, has been the influence of Hinduism.' পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনে স্বামীজীর এই বাণী আজীবন সক্রিয় থেকেছে। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ ও শ্রী গোলওয়ালকরের রচনা ও বাণী দীনদয়ালজীর জীবনে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে আজীবন। তাঁর জীবন ছিল সেবা ও সমর্পণে ঋদ্ধ। দীর্ঘদিন তিনি সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, হাজার হাজার বন্ধু ও অনুগামীকে তিনি হিন্দু সমাজ ও দেশসেবার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বেশ কিছুদিন সাংবাদিক হিসেবেও কাজ করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেন। তিনি এই সময় পত্রিকা সম্পাদনা এবং সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'রাষ্ট্রধর্ম প্রকাশন লিমিটেড' স্থাপন করেন। এই প্রকাশনার অধীনে 'রাষ্ট্রধর্ম', 'পাঞ্চজন্য' ও 'স্বদেশি' নামে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এর মধ্যে 'স্বদেশ' দৈনিক পত্রিকা, 'পাঞ্চজন্য' সাপ্তাহিক এবং 'রাষ্ট্রধর্ম' মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতো। এর মধ্যে দীনদয়ালজী পাঞ্চজন্য এবং স্বদেশ নিজেই সম্পাদনা করতেন।

তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে। তিনি ছিলেন একজন দ্রষ্টা। তিনি দেশের মানুষের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করতে পারতেন এবং তাদের দুঃখদুর্দশা দূর করাকে তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের অবস্থাই হলো দেশের উন্নতি পরিমাপের মাপকাঠি। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে মুম্বাইয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী বলেছিলেন, 'সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হিসেবে তাঁকে একজন বালক থেকে বেড়ে উঠতে দেখেছি আমি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যিনি সেই সময় ভারতীয় ভাবধারায় গঠিত একটা রাজনৈতিক দল গড়তে চাইছিলেন, তিনি সঙ্ঘের কাছে কিছু আদর্শনিষ্ঠ কর্মী চাইলেন। আমরা তাঁকে (দীনদয়াল) দিয়েছিলাম। জনসঙ্ঘের অগ্রগতিতে প্রমাণ হয়, তিনি একজন মহান কর্মী ছিলেন। আমি তাঁর সামর্থ্য, বাগ্মিতা এবং বুদ্ধিমত্তার কথা জানতাম। সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় আমি আগেই পেয়েছিলাম।' সুতরাং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন ভারতীয় আদর্শ ও দৃষ্টিকোণের উপর ভিত্তি করে একটা রাজনৈতিক দল গঠন করতে চাইলেন এবং এই বিষয়ে শ্রীগুরুজীর সাহায্য চাইলেন তখন শ্রীগুরুজী কয়েকজন আদর্শনিষ্ঠ, কুশলী স্বয়ংসেবককে রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ করতে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, অধ্যাপক বলরাজ মাধোক, সুন্দরসিংহ ভাণ্ডারী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, জগদীশপ্রসাদ মাথুর প্রমুখ। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর দিল্লির রাঘোমল আর্য উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এক সম্মেলনে অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপিত হয়। প্রায় তিনশো প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁরা সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। নতুন এই দলের দ্বার ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়ের জন্য অবারিত করে দেওয়া হয়। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রথমে উত্তরপ্রদেশের সাধারণ সম্পাদক এবং রাও কৃষণপাল সিংহ সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক কর্মযোগী। তাঁর নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতায় আস্থাবান ড. মুখোপাধ্যায় এক বছরের মধ্যেই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করেন। অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত দীনদয়ালজী তাঁর সমস্ত মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে নতুন দলের বিস্তারে মনোযোগী হলেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন শ্রীনগরের কারাগারে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক অকালমৃত্যুর পরে দলকে সর্বভারতীয় স্তরে উন্নীত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই দল সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করে। দলের আদর্শগত ভিতও তাঁরই হাতে তৈরি হয়।

তিনিই প্রথম ভারতে ক্রিয়াশীল অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জনসঙ্ঘের রাজনৈতিক 'দর্শনের' তফাতটা ব্যাখ্যা করেন। মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন, জিবতরাম ভগবানদাস কৃপালনি, চৈতরাম গিদওয়ালি প্রমুখ ভারতপন্থী নেতৃত্ব কংগ্রেস দল থেকে অপসৃত হলে দলটি ইউরোপীয় ভাবধারা ও বামপন্থায় বিশ্বাসী জওহরলাল নেহরুর সম্পূর্ণ কবজায় চলে যায়; দলে ভারতীয় ভাবধারা নিয়ে চর্চা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। দলটিতে ভারতীয় ভাবনাচিন্তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেশে ভারতীয় ভাবধারার উপর

আধারিত দল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপিত হয়। দিল্লি থেকে প্রকাশিত রাজনৈতিক মাসিক পত্রিকা Moral (এখন পত্রিকাটি বন্ধ)-এর সংবাদদাতা হেক্টর অভয়বর্ধনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেন, 'We should take the view that the politics of India had been moulded on foreign ides to the neglect of Indian tradition, culture and heritage. Hence the need of a party deriving its basic inspiration from within.' (Moral, May 1960)। এটাই সম্ভবত ভারতীয় 'দৃষ্টিকোণ' বলতে কী বোঝায় তার সঠিক বিশ্লেষণ। এছাড়াও তিনি ১৯৬২-তে প্রকাশিত United Asia-র জানুয়ারি সংখ্যায় The jana Sangh Perspective শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'The Jana Sangh was formed as an all-India party on 21 October 1951. It was not a disgruntled, dissident, or discredited group of Congressmen who formed the nucleus of the party, as is the case with all other political parties. Its inspiration came from those who basically differed from the Congress outlook and policies. It was an expression of the nascent nationalism.'

আসলে নেহরুবাদী রাজনীতির কারণে দেশে ক্রমবর্ধমান হতাশার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। লোকে নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে খুব বেশি পশ্চিমি ভাবাপন্ন এবং জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে পাকিস্তান ও চীনের প্রতি নরম নীতি অবলম্বন করে চলে বলে মনে করত। এই রকম এক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদানের পরে তিনি সাহিত্য রচনার পথও ত্যাগ করেন। সঙ্ঘের প্রচারক বাপুরাও মোঘে বলেছেন, তাঁর সঙ্গে যখন হায়দরাবাদে জনসঙ্ঘের সম্মেলনে দেখা হয় তখন তাঁর প্রশ্নের উত্তরে উপাধ্যায়জী বলেছিলেন যে, জনসঙ্ঘে যোগদানের পরে তাঁর সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা তাঁদের ভাষাতেই উপস্থাপিত করা উচিত; তাই তিনি সাহিত্যের ভাষা ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের ভাষা গ্রহণ করেছেন। এমনই ছিল তাঁর সমর্পণ ভাবনা।

দলের সংগঠনের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দলের নীতি ও আদর্শের রূপরেখা তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। তখন অবধি দলের কোনো অর্থনৈতিক ভিত ছিল না। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচি তৈরি করেন। যদিও তিনি বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করলেও কখনো অর্থনীতি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেননি। ফলে তিনি অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রচুর পুস্তক অধ্যয়ন করলেন। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত অর্থনৈতিক নীতি শুধু পুস্তকে পঠিত জ্ঞানে সীমিত ছিল না। এজন্য তিনি দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করলেন। পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দলের আর্থিক নীতি প্রণয়ন করেন তিনি। তিনি অর্থনীতি বিষয়ে এতটাই জ্ঞান আহরণ করেন যে তার উপর ভিত্তি করে প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর ইংরেজিতে একটি পুস্তক, Two Plans লেখেন।

বইটি বিভিন্ন মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। বইটির দ্বিতীয় পর্বও তিনি লিখেছিলেন কিন্তু ভ্রমণকালে সেই 'পাণ্ডুলিপি' হারিয়ে যায়। বাপুরাও মোঘে তাঁকে হারিয়ে যাওয়া পুস্তকটি আবার লিখতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে তিনি তা করে উঠতে পারেননি। যদিও তিনি ভারতীয় অর্থনীতির উপর আরেকটি পুস্তক, Principle and Policy : Promises, Performences, Prospects নামে ভারতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করে পুস্তক লিখেছিলেন। এই পুস্তকটি তাঁর ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি ভারতের অবস্থার প্রেক্ষিতে মনে করতেন যে, দেশের পক্ষে 'শ্রম-অনুসারী' বা Labour-intensive অর্থনীতিই শ্রেয়। এজন্য তিনি গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে কৃষিভিত্তিক শিল্পের উপর জোর দিয়েছিলেন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান হবে এবং গ্রামীণ মানুষকে গ্রাম ত্যাগ করতে হবে না। এ ছাড়াও তিনি আরও দুটি বই, Indian Economic Policy : Direction to Development এবং Devaluation : A Great Fall তিনি লেখেন। একমাত্র অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই এটা সম্ভব।

দলে সংগঠনের গুরুত্ব তিনি বুঝতেন। দলের স্থায়িত্বের জন্য দৃঢ় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে তিনি দলকে কর্মীভিত্তিক, একটি সুসংবদ্ধ আকার দিতে সচেষ্ট হন। ভারতীয় জনসঙ্ঘ এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি একটি কর্মীভিত্তিক (cadre based), আদর্শনিষ্ঠ দল হিসেবে পরিচিত। আর এর পুরো কৃতিত্বই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের। একটার পর একটা ইউনিট গড়ে তিনি দলকে সুদৃঢ় ভিতের উপর দাঁড় করান। তাঁর চেষ্টার ফলেই দল আজকের এই পরিচিতি পায়; জনসঙ্ঘ সত্যিকারের জনসঙ্ঘ হয়ে ওঠে।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের কথা সম্পূর্ণ হবে না যদি না আমরা তাঁর প্রবর্তিত 'একাত্ম মানবদর্শন' বা Integral Humanism সম্পর্কে কোনো আলোচনা না করি। এই প্রবন্ধের পরিসরে 'একাত্ম মানবদর্শন' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। খুব সংক্ষেপে আমরা তাঁর 'একাত্ম মানবদর্শন' সম্পর্কে আলোচনা করব।

দীনদয়ালজীর 'একাত্ম মানবদর্শন' তাঁর সামগ্রিক চিন্তাভাবনার সুচিন্তিত নির্যাস। তাঁর মতে, যারা কোনো একটি সমস্যার কেবলমাত্র একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে তাঁরা সত্যে উপনীত হতে পারে না। সত্যে উপনীত হতে গেলে সামগ্রিক দৃষ্টিতে কোনো বস্তুকে দেখতে হবে। কোনো অর্থনৈতিক নীতি কেবলমাত্র একজন শ্রমিক, একজন শিল্পপতি বা একজন উপভোক্তার লাভের কথা ভেবে স্থির করা উচিত নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথাই হলো জীবনকে সামগ্রিকতায় দেখা

এবং ব্যক্তির জীবনবোধকেও স্বীকৃতি দেওয়া। এখানে বৈচিত্র্য ও বহুমুখিনতায় সকলে বিশ্বাসী। পশ্চিমি দার্শনিকেরা দ্বৈতসত্তার নীতিতে আশ্বস্ত। জার্মান দার্শনিক হেগেল থিসিস, অ্যান্টি-থিসিস এবং সিনথিসিসের কথা বলেছেন। কার্ল মার্কস এই তত্ত্বকে অবলম্বন করেই ইতিহাস ও অর্থনীতির ব্যাখ্যা করেছেন। ডারউইন জোর দিয়েছিলেন যোগ্যতমের স্বীকৃতির উপরে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা হয়েছে। তিনি তাঁর এই তত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছিলেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে এক অবিচ্ছেদ্য তারই ভিতের উপর, কেবলমাত্র সামাজিক সাম্যের উপর নয়। এই মতবাদ ব্যক্তির শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আর্থিক বিকাশ অর্জনের পক্ষে এক সুসংহত পন্থা। সেই সময়ে দেশে ও বিশ্বে প্রচলিত মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, সমাজতন্ত্র মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের কথা বলেছে, অর্থাৎ মানুষের শরীরের চাহিদার কথা শুধু বলেছে। কিন্তু মানুষ তো শুধু শরীর নিয়ে গঠিত হয় না; মানুষ হলো শরীর, মন, আত্মা ও চিত অর্থাৎ বুদ্ধির সমষ্টি। মানুষকে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি, মনন অথবা আত্মা ছাড়া ভাবাই যায় না বাস্তবে। মানুষকে তাঁর এই সমস্ত বৈশিষ্ট-সহ সমগ্রতায় ভাবলে তবেই তাঁকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। আর এই সামগ্রিক চিন্তাভাবনাই হলো 'একাত্ম মানবদর্শন'। মানবদেহ নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত, কিন্তু আত্মা নামের এক শক্তি এই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি দেখেছেন, পশ্চিমের একদল দার্শনিক সমাজকে অবহেলা করে ব্যক্তিতান্ত্রিকতায় জোর দিয়েছেন; আবার মার্কসবাদীরা ব্যক্তিকে অবহেলা করেছেন তাঁদের দর্শনে। তাঁদের মতে, সমাজের স্বার্থ ও ব্যক্তির স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। মার্কসবাদীদের মতে, সমাজ নিরন্তর শ্রেণীসংঘাতের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আর এই পারস্পরিক সংঘাতের ফলে জন্ম হয় কিছু রক্তপিপাসু একনায়কের। ক্ষমতা দখলের পথ হয়ে ওঠে রক্তাক্ত। আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থ পিপাসাই হয়ে ওঠে মানুষের একমাত্র অবলম্বন। 'একাত্ম মানবদর্শন' বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলেছে।

দীনদয়ালজী দেখালেন, যদি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে দেখা যায়, বিদ্বেষ ও বিরোধিতা নয়, পারস্পরিক নির্ভরতা, সৌহার্দ্য এবং একে অন্যের প্রশংসার মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃতির নিয়ম। উপনিষদের 'দ, দ, দ' অর্থাৎ 'দাম্যত', দত্ত, দয়ধ্যম্' এই তিন 'দ' এর উপর ভিত্তি করেই আবহমানকাল ধরে প্রকৃতি চলছে। তিনি বললেন, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলির ব্যবস্থা যে কোনো ভাবে করতেই হবে। কেবলমাত্র ভারতীয় জীবনদর্শনের উপর ভিত্তি করে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গই মানুষের জীবনের স্ববিরেধিতা দূর করে তাকে সার্থক করে তুলতে পারে। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে তিনজন রাজনীতিবিদ তিনটি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের জন্ম দিয়েছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের' তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ 'টোটাল রেভোলিউশন' বা 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি'র জন্ম দিয়েছেন এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় Integral Humanism বা 'একাত্ম মানবদর্শন'-এর উদ্ভাবন করেছেন। এই দর্শনে তিনি ব্যক্তির উপর জোর দিয়েছেন। কমিউনিস্ট দেশ যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে ব্যক্তির উপর জোর দেওয়া শুরু করেছিলেন ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে।

তাঁর মতে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ দেশ থেকে ধীরে ধীরে কমে যাওয়া উচিত। এম এন রায় এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের মতে, দলবিহীন গণতন্ত্রই পথ। ভারতবর্ষে দলবিহীন গণতন্ত্রের উদাহরণ রয়েছে 'ষোড়শ মহাজনপদের' শাসন ব্যবস্থায়। ভারতীয় ব্যবস্থায় জে পি-র 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি', এম এন রায়ের 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম' এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্ম মানবদর্শন'-এর মধ্যে কোনটি বেশি প্রযোজ্য তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দীনদয়ালজীর 'একাত্ম মানবদর্শন' অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন; এর ব্যাপ্তি অনেক বৃহত্তর। আধুনিককালে বিভিন্ন 'চ্যালেঞ্জ'-এর উত্তর হলো দীনদয়ালজীর 'একাত্ম মানবদর্শন'। সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের ভারতীয় বিকল্প হলো এই দর্শন। এর মূল প্রোথিত আছে অতীতে, কিন্তু এর দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে ভবিষ্যতে। জে পি তাঁর 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি' বলতে সঠিক কী বোঝায় তার কোনো ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা দেননি। কথাটা ভিন্ন প্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডে ব্যবহৃত হয়েছিল।

দীনদয়ালজী তাঁর এই প্রসিদ্ধ দর্শনকে ১৯৬৫-র এপ্রিলে পুনেতে প্রদত্ত চারটি ভাষণে একটা বিধিবদ্ধ আকার প্রদান করেন। অবশ্য এর আগেই ১৯৬৫-র জানুয়ারীতে বিজয়ওয়াড়ায় জনসঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় দলে তাঁর এই দর্শন দলের মূলগত তাত্ত্বিক ভিত বলে গৃহীত হয়। পরে, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কালিকটে দলের চোদ্দতম বার্ষিক সম্মেলনে দীনদয়াল উপাধ্যায় সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে একাত্ম মানবদর্শনের' প্রয়োগ বাস্তব রাজনীতিতে করতে শুরু করেন। কিন্তু মাত্র দুই মাসের মধ্যেই তাঁর অকাল মৃত্যুতে তিনি এই তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার অবকাশ পাননি। সভাপতি হবার মাত্রই ৪৩ দিন পরে রহস্যজনক ভাবে মুঘলসরাই স্টেশনে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

একাত্ম মানবদর্শন মানুষকে তার সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে তাঁকে একাত্ম মানবের অংশীভূত করতে চেয়েছে। যে জনসঙ্ঘকে দীনদয়ালজী পুষ্পেপত্রে বিকশিত করেছিলেন তা এখন আর নেই; জনসঙ্ঘের উত্তরসূরী ভারতীয় জনতা পার্টি এখন কেন্দ্রের শাসক দল, বিভিন্ন রাজ্যেও তাঁরা শাসন করছে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্ম মানবদর্শন' এবং তাঁর প্রদর্শিত পথেই এগিয়ে চলেছে। তাঁর নীতি ও আদর্শ আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁকে যথার্থ সম্মান জানানোর প্রকৃষ্ট উপায় হলো যে বৈশিষ্টগুলি তিনি মেনে চলতেন তা অনুসরণ করা, যে আদর্শ তিনি প্রচার করতেন তা বাস্তবে প্রয়োগ করা এবং যে ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেই ভারত প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাওয়া। তবেই তাঁর স্বপ্ন সফল হবে এবং 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। □

ডাক যদি অন্তর থেকে হয়, তবে সাড়া মিলবেই

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্নীতি মুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। প্রথমে কতজন মুচকি হেসেছিলেন। কেউ কেউ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। মোদীজী সব দিক ভালো করে ভেবেচিন্তে এগিয়েছেন। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখনই অর্থনীতির ক্লাসে বলা হতো, ভারতের কয়েকটি পরিবারের হাতে সিংহভাগ সম্পদ আছে। আর দীন-দরিদ্রদের রাতের ঘুম হয় অভুক্ত থেকে। তরুণ মন, এসব কথা শোনার পর ভালো থাকার নয়। আমাদেরও তাই হয়েছিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র বলে সাম্যবাদ-সমাজবাদ নিয়ে আগ্রহভরে খোঁজখবর নিতে শুরু করি। তাতে অনেক ফাঁকফোকর নজর এড়িয়ে যায়নি। বিশেষ করে দেশ ভেদে এক নীতি একদেশে ক্লিক করলেও অন্য দেশে তার সঠিক প্রয়োগের নিশ্চয়তা পায়নি। ওই সময়েই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন পড়ি। তখন আশার আলো দেখতে পাই। এরপর ইন্দিরা গান্ধী তার নড়বড়ে চেয়ারকে মজবুত করার জন্য তৎকালীন ১৪টা ব্যাংককে রাষ্ট্রীয়করণের নামে সরকারীকরণ করেন। এরপর আবার চমক দেওয়ার জন্য ১৯৮০ সালে আরও ৬টি ব্যাংককে ওই একই ভাবে সরকারীকরণ করেন। দেশের কতখানি লাভ হয়েছিল তা বলার আগে বলতে হয় ব্যাংক কর্মচারীদের লাভ হয়েছিল দুই ভাবে। (১) ব্যাংকে নিয়োগ অনেক হয়েছিল। (২) কর্মীদের কম কাজ করতে হতো। নজরদারি হালকা হয়েছিল। ঋণদান বেড়ে ছিল। আর বছরের শেষ দিনে ঋণের বিপুল সুদ হিসাব করে লাভ দেখানো হতো। যে কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বা উঠে গেছে তাদের ঋণের সুদ বছরের পর বছর সুদের উপর সুদ গোনা হতো। ভেতরে ভেতরে ব্যাংক ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল।

কংগ্রেসি অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনার্দন পূজারি 'লোন মেলা'র নামে জোর করে ব্যাংকের পদস্থ অফিসারদের দিয়ে ঋণ দিতে বাধ্য করেছিল। এতে কংগ্রেস তার রাজনৈতিক জমি যেমন শক্ত করেছিল ঠিক তেমনি দেশের দ্বিগুণ ক্ষতি করেছিল। অটলজী প্রধানমন্ত্রী হয়েই ব্যাংকের সুদের উপর সুদ গোনার window dressing বন্ধ করে non performing asset আলাদা করার নির্দেশ দেন। তার উপর সুদ গোনা বন্ধ করেন। ফলে রাতারাতি বহু ব্যাংক লাভ থেকে লোকসানে চলে যায়। অটলবিহারী সরকার এককালীন টাকা দিয়ে কড়া নির্দেশ দেন লাভে ফেরার ব্যবস্থা নিতে। বলে দেন লাভ না করতে পারলে প্রতিষ্ঠানের নাম তার থাকবে না। শুরু হয় কড়াকড়ি। নজরদারি বাড়ানো হয়। আগে এর শিল্পে শ্রমিক ইউনিয়ন ব্যাংক ম্যানেজমেন্টকে গান পয়েন্টে রাখতো। আর সরকার নজরদারি বাড়াতেই ম্যানেজমেন্ট ইউনিয়নকে গান পয়েন্টে রাখতে শুরু করে। এতেই বিজেপিকে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস ইউনিয়ন শত্রুতে পরিণত করে।

পরের দশ বছর আবার যে কে সেই। দুর্নীতি, চুরি ও কেলেঙ্কারি যেন সরকারের কাজ হয়েগিয়েছিল। পাকিস্তান তার লাল চোখ দেখাতে শুরু করেছিল। ২৬/১১-র কড়া জবাব ইউপিএ সরকার দেখাতে পারেনি। আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত কেলেঙ্কারি। এই সময় মোদীজী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কোনো ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী মোদীজীর দৃষ্টি এড়ায়নি।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেই মোদীজী খুব ভালো ভাবে রাজ্যে রাজ্যে দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির উপর কড়া নজর দিতে শুরু করেন। যারা অতি সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন তাদের প্রতি কঠোর হাতে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জেলের দরজা দেখাবেন এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ওরা যতই প্রতিহিংসার তত্ত্ব খাড়া করুক তা ধোপে টিকবে না। নরেন্দ্র মোদীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডাক দেশের আপামর জনসাধারণ দু'হাত তুলে সমর্থন করছেন। এই ডাক যে তিনি অন্তর থেকে ডেকেছেন। মুখ খুলছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী। শুরু হয়েছে। আটকানো অসম্ভব। সাধারণ মানুষের জয় অনিবার্য।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

নীতিকথা শেখাবেন না

গত ৬ সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে লেখা এই চিঠি। নিজের দলের নেতা নেত্রীদের বিপুল চুরি, নয়ছয়কে তুচ্ছ দু' একটা ছোটোখাটো ভুল বলে চালিয়ে দিতে চাইলেন। তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে তিনি নেতাজীকে টেনে এসেছেন। জানি না নেতাজী কবে, কখন, কোথায় ভুলকে অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নেতাজী এই উক্তি কোথায় করেছিলেন তার উল্লেখ করেননি তিনি। এখন ভুলকে যদি অধিকার বলে মেনে নিই, তাহলে একজন খুনি তার খুনকে ভুল বললে সেটা তো অধিকার বলে মেনে নিতে হবে, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী। যদি খুন, চুরি, চাকরি বিক্রি, গোরু, কয়লা, বেআইনি পাচার কিংবা অনুব্রতর বীরভূমে যে বেআইনি চল্লিশটা টোল প্লাজা চলছিল যা অনুব্রতর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়, এসব যদি মুখ্যমন্ত্রীর কথায় অধিকারের পর্যায়ে পড়ে তাহলে জনগণের টাকায় আদালতের, বিচার ব্যবস্থার দরকার কী? নিজের দলের অপকর্ম ঢাকতে এমন অপযুক্তি আগে কেউ শুনেছে কিনা জানা নেই। মুশকিল হলো নেতা-নেত্রীরা যখন মঞ্চ থেকে এই সব প্রলাপ বকেন তখন সবাই চুপচাপ শোনে, আর নেতা-নেত্রীরা তাদের বক্তব্যে শ্রোতারা মান্যতা দিচ্ছে ভেবে শ্লাঘা অনুভব করেন। ওই মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বাচ্চাদের নৈতিক পাঠের শিক্ষা দিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে, শিক্ষকের মতো পবিত্র পেশাকে তাঁর দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা যেভাবে টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি করে কলুষিত করেছেন তাতে যাই হোক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নৈতিকতার পাঠ নিতে এরাজ্যের বাচ্চারা কতটা আগ্রহী হবে জানা নেই। আর পূজার অনুদান? এ তো চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ। প্রতি পূজায় ষাট হাজার টাকা অনুদানের অর্থ হলো সমাজ বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা যারা ভোট লুট করে, সন্ত্রাস করে দলকে ক্ষমতাসীন করবে। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ, যতদিন ক্ষমতায়

ফঃ ৩

আছেন থাকুন, নীতিকথা আর শেখাবেন না, আপনার কাছে নীতিকথা শিখলে ভুল শিখবে এ রাজ্যের বাচ্চারা। তাতে রাজ্যের ক্ষতিই হবে।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলী।

ছবি বিতর্ক

ছবি বনাম ছবি, রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রও এখন ছবি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। তেলেঙ্গানার এক রেশন দোকানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি কেন নেই, কামারেডির জেলা শাসক জিতেশ পাটিলকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের তর্জনী তুলে জনসমক্ষে ধমক দেখে চমকে উঠি। এ কোন রাজার দেশ। গণতান্ত্রিক দেশে কেন এ ব্যক্তি পুজো? ভারত সরকারের লোগো গর্বের নয় কী? আমাদের রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণার হোর্ডিং-সহ তাঁর ছবিতে কলকাতা ঢেকে গেছে। 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির শহরে পরিণত হয়েছে। এখন 'তিলোত্তমা'কে মমতাময়ী বলে মনে হয়। 'তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লিখা।' তা তো নয়। কোষাগার শূন্য করে উদ্যানে উদ্যানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর বিএসপি চিহ্ন হাতির স্ট্যাচুর কথা মনে করায়।

গণতন্ত্রে এমন ব্যক্তিপুজো অতীতের স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের কথা মনে করিয়ে দেয়। হিটলার, টিটো, তোজোর নৃশংসতার কথা ঘৃণার সঙ্গে মনে করিয়ে দেয় যা আমরা সহজে ভুলতে চেয়েছি। আমরা আজ অনেক পথ অতিক্রম করে বহু কষ্টে অর্জিত গণতন্ত্রের পথে হেঁটে চলেছি। এই গণতন্ত্র কেমন হবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলা যায়, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?' রাজা (রাষ্ট্রপ্রধান) এবং প্রজা (জনগণ) সমার্থক হলেই গণতন্ত্রের বিকাশ নইলে সর্বনাশ। কিন্তু এখানে ছবি বিতর্কে রাজা এবং প্রজার মধ্যে জনমানসে বিভাজন রেখা সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি সংঘাতের কারণ হয়ে ওঠে যা গণতন্ত্রের মূলে সজোরে কুঠারাঘাত করে। কেন্দ্র ও রাজ্য ব্যক্তি বিশেষের ছবি তুলে দিয়ে ব্যক্তি সংঘাত বন্ধ করে সুস্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় দেবে জনগণ এমন প্রত্যাশা করে।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের সম্মান

প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষকদের স্থান সমাজে উঁচুতে ছিল। বাবা- মায়ের পরেই শিক্ষকদের সম্মানের জায়গা ছিল। গুরুগৃহে থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে হতো। গুরুরা পুত্রস্নেহে ছাত্র- ছাত্রীদের লেখাপড়া শেখাতেন। অতীতেও ভারতের ইতিহাসে শিক্ষকেরা সর্বোচ্চ সম্মানের জায়গা অলংকৃত করেছেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর জন্মদিন তাঁর যখন ছাত্ররা পালন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন আমার প্রতি শ্রদ্ধা তখনই জানানো হবে যখন গোটা শিক্ষক সমাজকে সম্মান জানানো হবে। তাই তাঁর জন্মদিনটিকে বর্তমানে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ.পি.জে. আব্দুল কালামও একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনিও দেশের সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করেছেন। তাই শিক্ষকেরা অতীত থেকেই সমাজের ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। কিন্তু বিগত এক দশকের মধ্যে বাঙ্গলার নোংরা রাজনীতির খেলায় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষকদের সম্মান একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকলেও শিক্ষা এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষক হলেন বিদ্যাপণ্যের বিক্রেতা আর ছাত্র-ছাত্রী হলো ক্রেতা। তাই ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা ক্রেতা-বিক্রেতার মতো। আগে শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা হলে ছাত্ররা নতমস্তকে প্রণাম করতো আর কুশল বিনিময় করতো কিন্তু বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীরা এই সৌজন্যটুকুও দেখায় না। বরং তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আসলে শিক্ষা আনে চেতনা আর চেতনা আনে মূল্যবোধ। আজ সেই মূল্যবোধের শিক্ষাটা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নেই। এর জন্য দায়ী শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা নয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থাটাই দায়ী। একদিকে শিক্ষকতার মতো মহান ব্রত পালনের জন্য যখন এই বাঙ্গলায় লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয় তখন সেই শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের কী শেখাবেন? তারপর একশ্রেণীর শিক্ষক বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা বিক্রি করছেন, ফলে সমাজের চোখে ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষক ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছে। তাই বর্তমান সরকার শিক্ষা অধিকার আইনের ২৮নং ধারা প্রয়োগ করে টিউশন বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। খুব ভালো কথা আগে শিক্ষকদের ওই আইনের ২৭নং ধারার চ্যাপ্টার ফোর অনুযায়ী শিক্ষকদের শিক্ষা বহির্ভূত কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। আসলে সরকারই বর্তমান শিক্ষকদের সমাজের শত্রু বানিয়ে তুলেছে। এমনিতেই সরকার অতিমারী করোনাকালে দু'বছর স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে শিক্ষকদের বেতন দিয়েছে। এতে সমাজের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষকদের নানা কটূক্তি করছেন। তারপরও মিড-ডে-মিল, পোশাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমাজের মানুষ চোরের আসনে বসাতেও পিছপা হচ্ছেন না। একটু উঁচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা তো শিক্ষকদের ঠাট্টা, মশকরা এমনকী গালমন্দ করতেও ছাড়ে না। কারণ তারা জানে শিক্ষকেরা ছাত্রদের মারধর করতে পারবেন না। ভয় ভীতি তো করেই না উপরন্তু শ্রদ্ধার জায়গাটাও সংকুচিত হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে লাগামছাড়া দুর্নীতিতে শিক্ষকদের সম্মান আরও তলানিতে ঠেকেছে। শিক্ষক কথার অর্থ : শি—শিষ্টাচার, ক্ষ—ক্ষমাশীলতা, ক—কর্তব্যপরায়ণতা। এই অর্থ অনেক শিক্ষক মহাশয় জানেন না। গুরু সম শিক্ষককুলকে অসম্মান করে কোনো জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে না। তাই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক মহাশয়দের হৃতগৌরব ও সম্মান ফিরিয়ে দিতে হবে। তবেই. শিক্ষক দিবস ঘটা করে পালন করা সার্থক হবে।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোনারোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

বৃত্তাকার অর্থনীতিতে মহিলারা

সুতপা বসাক ভড়

ভারতে প্রায় প্রত্যেকটি ঘরোয়া দ্রব্যের ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার করার প্রচলন আছে। এই প্রসঙ্গে SEWA (Self-employed Women's Association) কয়েক দশক ধরে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দুর্বল মহিলাদের সংগঠিত করে বৃত্তাকার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই রকম একটি ক্ষেত্র হলো বস্ত্র ব্যবসা, যেখানে মহিলারা পুরানো জামা-কাপড়ের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে থাকেন। তাঁরা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে এই কাজটি করেন বিনিময় পদ্ধতিতে। তথাকথিত উন্নত দেশগুলির মতো আমরা পরিবেশের মধ্যে দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে চলি না, পরিবর্তে মহিলারা চেষ্টা করেন বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিস ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহার করার।

এই পদ্ধতির একটি সামাজিক প্রভাবও আছে। এই বৃত্তাকার অর্থনীতি মহিলাদের কর্মসংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের সহায়তাও করে থাকে। এছাড়া আছে ছোটো-ছোটো ব্যবসা, যেখানে মূলত মহিলারা বাড়িতে বসেই সেলাই, ধোয়া ও প্যাকেট করে ওইসব কাপড়গুলো বিক্রি করে, যা অনেক গরিব মানুষ কিনে নেয় এবং এতে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়।

গরিব পরিবারের নতুন প্রজন্ম কর্মসংস্থানের জন্য উৎসুক হয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা পড়াশোনা করে কাজের সন্ধান করে। তখন তাদের প্রয়োজন হয় বিধিবদ্ধ পোশাকের। দোকানে এই ধরনের পোশাক কেনা অনেক সময় তাদের ক্রয়সীমার বাইরে চলে যায়, সেই ক্ষেত্রে তারা ওইসব ব্যবসায়ীর থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম দামে ওই ধরনের পোশাক পেয়ে যায়।

এইভাবে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মহিলারা সম্পূর্ণ বস্ত্র ছাড়াও, পোশাক বানাবার কারখানায় বিক্রি করা টুকরো-টুকরো কাপড় দিয়ে বাচ্চাদের জামা বানিয়ে থাকেন। অনেক রকম ছোটো ছোটো কাপড়ের টুকরো জুড়ে নতুন নক্‌শায় লেপের ওয়ার ইত্যাদিও বানিয়ে থাকেন।

যাঁরা এই বৃত্তাকার অর্থনীতিতে কাজ করেন, সেই মহিলাদের একটি বিকট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, তারা যখন শহরে কাজ করেন, তখন থাকে স্থান সমস্যা। তাদের জন্য নির্দিষ্ট মল, বাড়ি বা অফিস থাকে না। বরং বারবার তাদের কাছে বাধা আসে। তাদের জরিমানা করা হয়, এমনকী শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত করা হয়। আগে তাদের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পোশাক সংগ্রহ করতেন বিনিময়ে তাঁরা বাসনপত্র দিতেন। কিন্তু বর্তমানে গেট-বন্দি আবাসনগুলিতে তাদের প্রবেশাধিকার সহজে মেলে না। দ্বাররক্ষীরা তাদের কাছে টাকা চায়। এছাড়া তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক সমস্যার সমাধানেও কোনো ব্যাংক তাদের সাহায্য করতে চায় না। এজন্য SEWA ব্যাংক এদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। গুজরাটে এটি একটি সহযোগী ব্যাংক, যেখানে মহিলারা এর সাধারণ সদস্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটির সদস্যও বটে। এই ব্যাংকগুলি লাভদায়ক এবং গরিব মহিলাদের ঋণ দেয়। অন্যান্য রাজ্যেও এইরকম কার্যকরী ব্যাংক স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনেক সময় বর্জ্যপদার্থ জড়ো করা, ফেলা ইত্যাদির দায়িত্ব কোনো ঠিকাদার সংস্থাকে দেওয়া হয়, যারা বাড়ি বাড়ি ময়লা সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে। অথচ যারা ময়লা থেকে পুনর্ব্যবহার যোগ্য জিনিস সংগ্রহ করে তাদের অভাবে অনেক সময় আবর্জনার পাহাড় জমে যায়। ওই পাহাড় দিনে দিনে বড়ো হতে থাকে।

যদি আমরা আমাদের দেশের এই নিজস্ব বৃত্তাকার অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, তাহলে ওইসব বড়ো বড়ো সংস্থাকে নয়, বরং ওই গরিব মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে হবে; যারা আমাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে ঠিকঠাক করে অন্যের প্রয়োজনীয় জিনিসে রূপান্তরিত করে চলেছে। তা সত্ত্বেও আমরা ক্রমাগত এই অর্থনীতিকে অবহেলা করে চলেছি। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের অবশ্য কর্তব্য। নাহলে আমাদের শহরগুলি ধীরে ধীরে হয়তো আবর্জনার স্তূপে পরিণত হবে।

এক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা অনেকটা। আমাদের মা-কাকিমারা পুরনো কাপড় দিয়ে বাসনপত্র নিতেন। এখনও অনেক মহিলা বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেই একই কাজ করে থাকেন। প্রয়োজন শুধু একটু সহযোগিতার। আমরা পুরানো পোশাক কেচে পরিষ্কার করে একটি জায়গায় গুছিয়ে রেখে দিতে পারি এবং তারা এলে সেগুলির পরিবর্তে বাসন বা আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু তাদের থেকে নিতে পারি। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হলেও তারা সামাজিক ও চক্রাকার অর্থনীতিতে যে ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং তাদের পাশে দাঁড়ানো, একটু সহযোগিতা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

অটিজম চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অটিজম হলো শিশুদের মস্তিষ্ক বিকাশের একটি প্রতিবন্ধকতা ও স্নায়বিক দুর্বলতা। তাই অটিজমকে বলা হয় disorder. এটি কোনও disease নয়। ডাক্তারি পরিভাষায় Autism spectrum disorder। Spectrum disorder কথাটি অটিজমের বিশাল আওতার বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়। এই hidden disability কোনও সুনির্দিষ্ট অক্ষমতা নয়। অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের ভিতর সামাজিক আচার আচরণ, যোগাযোগ ও ব্যবহারের সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। শিশুরা প্রাকৃতিক নিয়মে চারপাশের মানুষের কাছে থেকে যে সব জ্ঞান আহরণ করে থাকে, তা অটিস্টিক শিশুরা করতে পারে না। সামাজিক রীতিনীতিগুলো দেখে বা শুনে শিখতে পারে না। শব্দ, আলো, স্পর্শ ইত্যাদির প্রতি অটিস্টিকদের আচরণ সাধারণের থেকে পৃথক ও অদ্ভুত। শারীরিক দিক দিয়ে অটিস্টিক এবং সাধারণের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা যায় না। অবশ্য অটিস্টিকদের মস্তিষ্কের আকৃতি সাধারণের চেয়ে আলাদা হয়ে থাকে। অটিস্টিক শিশুরা কখনো কখনো বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী ও জ্ঞানী হয়। তবে আট-দশটা শিশুর মতো এদের জ্ঞান সব দিকে সমান থাকে না। এদের কারো থাকে গণিতের উপর অসাধারণ জ্ঞান, কারও বিজ্ঞানের উপর। কেউ-বা অসাধারণ ছবি আঁকতে পারে। কারও আবার মুখস্থ বিদ্যা বেশি, অটিস্টিক শিশুকে সঠিক পদ্ধতিতে পরিচর্যা করলে সে হয়তো হয়ে উঠতে পারে একজন বিজ্ঞানী। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত আমেরিকার নোয়াম চমস্কিও অটিস্টিক।

বয়সভেদে অটিজম শনাক্ত করার কিছু সংকেত : আপনার শিশু ৬ মাসের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি না হাসে, ৯ মাসের ভিতর তার চতুঃপার্শ্বের মানুষের কথা, শব্দ, হাসি ও মুখের ভাবভঙ্গির সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ না করে, এক বছরের ভিতর কোনও অঙ্গভঙ্গি না করে (আঙুল দিয়ে দেখানো)— টাটা দেওয়া, হাত দিয়ে শক্ত করে ধরা, ১৬ মাসের ভিতর একটি বাক্যও যদি না বলে, ২ বছরের ভিতর দুটি শব্দের সংমিশ্রণে (অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি না করে) বাক্য না বলে, শিশুটির অর্জিত যোগাযোগ দক্ষতা বা সামাজিক দক্ষতা যদি হঠাৎ করে হারিয়ে যায়। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে শিশুটি অটিজমে আক্রান্ত হয়েছে।

অটিজমের কারণ : অদ্যাবধি অটিজমের কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে অটিজমের আক্রান্তের ক্ষেত্রে প্রজননগত ভিত্তি অনস্বীকার্য। শিশু মাতৃগর্ভে অটিজমে আক্রান্ত হয়। যার প্রকাশ ঘটে ১৮ মাস বয়স থেকে ৩ বছরের মধ্যে। বেশ কিছু গবেষক মনে করেন অটিজমের মূলে দুটি কারণ, একটি জিনগত সমস্যা, অন্যটি পরিবেশের বিষাক্ত উপকরণ। আগে বা পরে মাথায় আঘাত, শারীরিক নির্যাতন, ভয়, শিশুর সঙ্গে অমানবিক অনৈতিক আচরণ ইত্যাদির মাত্রা বেশি হলে যে কোনও মানুষের মধ্যে সাময়িক অটিজমসুলভ আচরণ বা বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে পারে।

অটিজম শিশুদের তিনটি প্রধান সমস্যা : (১) মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগের সমস্যা, (২) স্বাভাবিক সামাজিক যোগাযোগের সমস্যা, (২) স্বাভাবিক সামাজিক আচরণ সমস্যা, (৩) খেলার ক্রিয়াকলাপে এবং কল্পনাযুক্ত খেলার সমস্যা। এছাড়া পুনরাবৃত্তিমূলক এবং রুটিন পরিবর্তনের বিরোধিতা করা, এসবের প্রকাশ ঘটে শিশুর আচার-আচরণের মাধ্যমে। যেমন একা থাকতে ও খেলতে পছন্দ করা, ডাকলে সাড়া দেয় না। অকারণে হাসে ও কাঁদে। কোনও জিনিসের প্রতি বিশেষ আসক্তি, বুড়ো আঙুলের উপর ভয় দিয়ে হাঁটে, অকারণে শরীর দোলায় বা হাততালি দেয়, কথা বলতে না পারা,আদে কথা বললেও পরবর্তী সময়ে কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া। অনেকের সর্বনাম ব্যাপারে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। 'আমি'-এর জায়গায় 'তুমি' বলে। অনেকের ব্যথার অনুভূতি কম আবার কেউ কেউ অস্বাভাবিক ব্যথার প্রতিক্রিয়া দেখায়। অস্থির প্রকৃতির, জেদি ও আক্রমণাত্মক আঘাত করে, অহেতুক ভীতি। এক-তৃতীয়াংশ Austistic শিশু বয়ঃসন্ধিকালে মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়। তাদের কাজে বাধা দিলে খিঁচুনি ভাব দেখা দেয়।

অটিস্টিক শিশুরা কি মানসিক রোগী বা প্রতিবন্ধী?

না, এরা প্রতিবন্ধী নয়। এদেরকে ইনটেলেকচুয়ালি ডিমান্ডিং বা স্পেশাল চাইল্ড বা গিফটেড চাইল্ড বলা হয়ে থাকে। তবে ৩০ শতাংশ অটিস্টিক শিশুর বুদ্ধি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কিছুটা কম হয়। ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশের বুদ্ধিবৃত্তি উল্লেখযোগ্য ভাবে কম থাকে। সর্বপ্রথম অটিজমের-বিবরণ দেন 'Kanner' ১৯৪৩ সালে। শুরুতে তিনি ভেবেছিলেন সব অটিস্টিক শিশুর বুদ্ধির প্রক্রিয়া স্বাভাবিক স্তরের কিন্তু পরে তাঁর এই বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অটিজম কোনও মানসিক রোগ নয়। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধী থেকে অটিজমকে বিভিন্ন কারণে আলাদা করা হয়েছে। অটিজমে আক্রান্তরা কম-বেশি যোগাযোগ প্রতিবন্ধী। এদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি অন্য প্রতিবন্ধী থেকে আলাদা। অবশ্য অনেকের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও অটিজম এক-সঙ্গে দেখা যায়।

হোমিওপ্যাথিতে অটিজম রোগীর চিকিৎসা : হোমিওপ্যাথিক মতে অটিজম একটি চিররোগ (Chromic disease)। হোমিওপ্যাথিক মতে Constitutional এবং Anti miasmatic treatment-এর মাধ্যমে শুধু Antism নয়, সব ধরনের জেনেটিক রোগের ভয়াবহ বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

ধনতেরাস এখন বাঙ্গালিরও উৎসব

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল যখন বলা হতো ধনতেরাস হলো উত্তর ভারতের উৎসব। কিন্তু এখন বোধহয় সেটা আর বলা যায় না। ধনতেরাসের সাতদিন আগে থেকেই বাঙ্গালি সোনারংপোর অলংকার কেনার জন্য ছোটোবড়ো নানান জুয়েলারি শপের সামনে লাইন দেয়। ওইদিন অনেকে বাড়িতে লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজোও করেন। পশ্চিমবঙ্গে দিন দিন যে এই উৎসবের জনপ্রিয়তা বাড়ছে সেকথা বলাইবাহুল্য। কিন্তু ধনতেরাস সম্বন্ধে প্রাথমিক কিছু তথ্য আমরা অনেকেই জানি না। এই নিবন্ধে সেই মৌলিক প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ধনতেরাস অথবা ধনত্রয়োদশী হিন্দুদের একটি প্রচলিত উৎসব। কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ দিনে এটি অনুষ্ঠিত হয়। ধনতেরাস দেওয়ালির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অনেকে ধনতেরাসের দিনটিকে দেওয়ালির প্রথম দিন হিসেবে গণ্য করেন, আবার অনেকে মনে করেন এটি দেওয়ালির দ্বিতীয় দিন। এই দিনে প্রখ্যাত আয়ুর্বেদাচার্য ধন্বন্তরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মতিথি হিসেবেও দিনটি পালিত হয়। আবার শতানন্দ

রচিত সৎসঙ্গী জীবন অনুসারে এই দিনটি কৃষ্ণের অলংকার পরিষ্কার করার দিন।

ধনতেরাসের আরও নাম

ধনতেরাস ছাড়াও এই উৎসবকে ধনত্রয়োদশী, ধন্বন্তরী ত্রয়োদশী এবং ধন্বন্তরীতেরাসও বলা হয়।

ধনতেরাসের দেব-দেবীরা

এই দিনে দেবী লক্ষ্মী, আচার্য ধন্বন্তরী, যমদেব ও কুবেরদেবের পুজো হয়ে থাকে।

ধনতেরাস শব্দের অর্থ

ধনতেরাস শব্দটি দুটি শব্দের যোগফল—ধন ও তেরাস। ধন মানে সম্পদ আর তেরাস মানে তেরো বা ত্রয়োদশী অর্থাৎ তেরোতম দিন। যেহেতু কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ দিনে উৎসবটি হয়, তাই এরকম নাম।

কেন পালিত হয় ধনতেরাস

ধনত্রয়োদশী সম্বন্ধে পুরাণে দুটি কাহিনি রয়েছে। এর মধ্যে একটি দেবী লক্ষ্মী ও আচার্য ধন্বন্তরীকে কেন্দ্র করে আর অন্যটি যমদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দুধসাগর থেকে আচার্য ধন্বন্তরী ও

দেবীলক্ষ্মীর উৎপত্তি

দেবতা ও অসুরেরা যখন সমুদ্রমন্থন করছিলেন তখন নানা মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছিল। মন্থন চলাকালীন আচার্য ধন্বন্তরী হাতে অমৃতভাণ্ড নিয়ে আবির্ভূত হন। সেদিন ছিল কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ দিন। অমৃতলাভের শুভক্ষণটি স্মরণ করতে এবং আচার্য ধন্বন্তরীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে আজও দিনটি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেবী লক্ষ্মীরও আবির্ভাব ঘটেছিল সমুদ্র মন্থনের ফলে।

রাজা হিমের পুত্র ও তাঁর স্ত্রীর কাহিনি

একদা এক রাজা ছিলেন, নাম হিম। রাজার ছেলেটি খুবই ভদ্র ও শিক্ষিত। এত ভালো সন্তান থাকা সত্ত্বেও রাজা হিমের মনে শান্তি নেই। কারণ এক জ্যোতিষী নিদান দিয়েছেন যে বিবাহের চতুর্থ দিনে ছেলেটি সাপের কামড়ে মারা যাবে। অথচ রাজপুত্র বিবাহ না করলে রাজ্য তার উত্তরাধিকারী পাবে না। সুতরাং রাজপুত্রের বিবাহ হয়ে গেল। নববিবাহিতা রাজবধূ স্বামীর অপঘাত মৃত্যুর ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। বিবাহের চতুর্থ দিনে তিনি ঘরের সব জানলা বন্ধ করে দিলেন। খোলা রইল শুধু দরজাটি। কিন্তু দরজার চৌকাঠে মণিমুক্তা, অলংকার আর স্বর্ণমুদ্রার এক পাহাড় খাড়া করে ফেললেন। স্বামী যাতে না ঘুমিয়ে পড়ে তার জন্য সারারাত সেই রাজবধূ নানারকম গল্প বলতে শুরু করলেন। গল্পের ফাঁকফোকরে গাইলেন গান। রাজপুত্রের প্রাণহরণ করতে সাপের ছদ্মবেশে এসে যমরাজ মণিমুক্তোর জৌলুস আর আলোর ঝলকানি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অলংকারের পাহাড়ে উঠতেই যমরাজের কানে এলো গল্প আর গান। সে গল্প এমনই চিত্তাকর্ষক এবং গান এমনই মধুর যে শুনতে শুনতে যমরাজ কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেলেন কী উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন। যখন মনে পড়ল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাজপুত্রের মৃত্যুর মুহূর্তটি পেরিয়ে গেছে। অগত্যা, যমরাজকে খালি হাতেই ফিরতে হলো। সেই দিনটি ছিল কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ দিন। এই দিনে একজন ধীময়ী নারী কীভাবে তার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন তা স্মরণ করা হয়।

কীভাবে পালিত হয় ধনতেরাস

ধনতেরাসের দিন ভক্তরা সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে অভয়াঙ্গ স্নান সেরে নেন। সারা বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। মেয়েরা দরজার সামনে আলপনা দেন। কেউ কেউ সিঁদুর মেশানো চালবাটার জল দিয়ে উঠোনে লক্ষ্মীর পা আঁকেন। সন্ধ্যেবেলায় সবাই নতুন জামাকাপড় পরে বাড়ির ভেতরে এবং চারপাশে মাটির প্রদীপ জ্বালেন। ধনত্রয়োদশীর প্রধান অনুষ্ঠান লক্ষ্মীপুজো। এই পুজো করতে হয় প্রদোষকালে অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে তার দু-আড়াই ঘণ্টার মধ্যে। সূর্যাস্তের সময় যেহেতু একেক জায়গায় একেকরকম, তাই পুজোর নির্ঘণ্ট স্থানবিশেষে বদলে যায়। যমরাজের স্তুতিতে যমপ্রদীপ দানম রীতি পালন করা হয় এই দিন। এই রীতি অনুযায়ী সারারাত দক্ষিণমুখী প্রদীপ জ্বলে। আবার কোথাও কোথাও জ্বলন্ত প্রদীপ নদী বা পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কাঠের পাটাতনে লাল কাপড় বিছিয়ে তার ওপর স্থাপন করা হয় লক্ষ্মী, গণেশ, কুবের ও ধন্বন্তরীর মূর্তি। কেউ কেউ এই দিন টাকা ও অলংকারের পুজোও করে থাকেন। প্রথমে হয় গণেশের পুজো। তারপর লক্ষ্মী,

কুবের ও ধন্বন্তরীর পুজো হয়। পুজোর পর বাজি পোড়ানো হয়।

ধনত্রয়োদশী কেন?

হিন্দুরা বিশ্বাস করে এইদিন লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজো করলে সৌভাগ্যলাভ হয় এবং সব ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পায়। যমরাজের পুজো করলে পরিবারে অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না। এবং ধন্বন্তরীর পুজো করলে অসুখ-বিসুখের হাত থেকে রেহাই মেলে।

ধনতেরাসে কী কিনবেন

(১) সোনা ও রুপোর অলংকার, (২) ধনে বীজ, (৩) স্টিল ও লোহার তৈরি বাসনপত্র ছাড়া অন্য যে-কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি বাসনপত্র, (৪) ঝাড়ু, (৫) ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র, (৬) ব্যবসা-সংক্রান্ত জিনিসপত্র ও (৭) গোমতী চক্র।

ধনতেরাসে কী করবেন না

(১) ধনে বীজ কাউকে দেবেন না। ধনে বীজ এই উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মনে করা হয়, রূপকার্থে ধনে হলো সম্পদ। তাই ধনে বীজ কাউকে দেওয়ার অর্থ দুর্ভাগ্যকে আহ্বান করা। শুধু তাই নয়, লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ধনে বীজ স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা। সুতরাং, ধনে বীজে পা দেওয়া বা যত্রতত্র ফেলে-ছড়িয়ে নষ্ট করা অসংগত। (২) ধনতেরাসের দিন টাকা ধার দেওয়া, ধার করা— এমনকী কারোর কাছ থেকে টাকা নেওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ তাতে দুর্ভাগ্যকে আহ্বান করা হয় এবং ঋণদাতা বা গ্রহীতা অর্থনৈতিক সংকটে পড়েন। (৩) এইদিন ধারালো জিনিস, চামড়ার জিনিস এবং লোহা ও স্টিলের তৈরি জিনিস কেনা নিষিদ্ধ, (৪) কাচের জিনিস কিনবেন না কারণ মনে করা হয়, কাচ ভেঙে যাওয়া দুর্ভাগ্যের প্রতীক, (৫) কালো রংয়ের জামাকাপড় পরবেন না, (৬) গাড়ি কিনবেন না, (৭) নকল সোনার (ইমিটেশন) জিনিস কিনবেন না, (৮) মাছ, মাংস খাবেন না, মদ্যপানও এইদিন নিষিদ্ধ ও (৯) এদিন বাস্তু শান্তির অনুষ্ঠানও করা চলবে না।

জৈন ধর্মে ধনতেরাস

জৈনধর্মে ধনতেরাসের দিনটি দেওয়ালির প্রথম দিন হিসেবে পালিত হয়। জৈনদের কাছে দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দিনেই ভগবান মহাবীর নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এইদিন জৈনরা সম্পদের দেবী অর্থাৎ দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করেন। শ্বেতাম্বর জৈন সমাজের মহিলারা এইদিন অলংকার পালিশ করানোর মাধ্যমে দেবী লক্ষ্মীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এবার ধনতেরাস আগামী ২৩ অক্টোবর। কালীপুজোর ঠিক আগের দিন। নিশ্চিতভাবে এবারও পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি এইদিন গয়নার দোকানে লম্বা লাইন দেবেন। যে-যার সামর্থ্য অনুযায়ী কিনবেন সোনা বা রুপোর অলংকার।

ভগবান কুবের ও দেবী লক্ষ্মীর কাছে সৌভাগ্য কামনা করবেন। আমরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব পশ্চিমবঙ্গের সৌভাগ্য যেন ফিরে আসে। ঠিক যেমন পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল। বারো মাসে তেরো পার্বণ প্রবাদটি তখনকার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে যেত। এখন কেমন যেন রসিকতা বলে মনে হয়। সম্পদের দেব-দেবীরা বাঙ্গালির প্রার্থনা মঞ্জুর করলে আর এমনটা মনে হবে না।

দিল্লিতে বাঙ্গালি মহাপুরুষদের স্মরণ সন্ধ্যা

‘স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অমৃতকালে যখন সারা দেশ অমৃতের আস্বাদ নিচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে গরল নির্গত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে। পশ্চিমবঙ্গ এখন সেদিনের কাশ্মীরের কথা মনে করিয়ে দেয়। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, আর্থিক কাঠামো, কর্মসংস্থান– সব বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ যে ভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তা থেকে পরিত্রাণের জন্য দিল্লির বাঙ্গালি সমাজকে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না।’– স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে দিল্লির লাজপত নগর সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের সভাগারে ‘বাংলাভাষা সমূহ, দিল্লি প্রান্ত’ আয়োজিত বাঙ্গালি মহাপুরুষদের স্মরণসন্ধ্যা অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল স্টাডিজ সিকিউরিটি বিভাগের অধ্যাপক ড. পার্থ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সহ সম্পাদক ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ। তিনি বলেন, ‘‘ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনেই পশ্চিমবঙ্গ ও পঞ্জাব খণ্ডিত হলো। একদিকে স্বাধীনতার আনন্দ, অন্যদিকে হিন্দু নরসংহার। মান সম্মান হারিয়ে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে হিন্দুদের গ্রহণ করতে হলো শরণার্থী জীবন। সেদিনের কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে দেশে স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আগামী অমৃতকালে দেশ বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করবে। ভারতবর্ষ এক দিন না একদিন অখণ্ড হবে। আসন্ন দুর্গাপুজোতে মায়ের কাছে এই প্রার্থনা করতে হবে। ইজরায়েলের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ইহুদিরা তাদের ভূখণ্ড ফিরে পেতে ২০০০ হাজার বছর ধরে প্রার্থনা করেছে। আমরা কি পঁচাত্তর বছরে ভুলে যাব? বর্তমান প্রজন্মকে নিয়ে যেতে হবে বাংলাদেশে। নিজেদের জন্মভিটা দর্শন করলে আত্মবোধ জাগ্রত হবে।’’ বক্তব্য রাখেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সৌম্য চক্রবর্তী, দিল্লি প্রান্তের সঙ্ঘকার্যকর্তা ওমপ্রকাশজী। এর পর দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রদীপ চক্রবর্তী, কল্যাণ আচার্য ও শ্রীমতী মঞ্জু সরকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শঙ্কর হালদার।

গোপালী আশ্রমের সরস্বতী ও সারদা শিশুমন্দিরে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে খড়্গপুর আইআইটি এসএমটিএস বিভাগের অধ্যাপক ড. শুভময় মণ্ডলের উদ্যোগে গত ১৫ আগস্ট পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপালী আশ্রমস্থিত সরস্বতী ও সারদা শিশুমন্দিরে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রফেসর মঞ্জুনাথ এম, ডাঃ প্রদোষ কুমার সারাঙ্গী (রেডিয়োলজিস্ট), ডাঃ চিত্তরঞ্জন মিত্তল (বিসিআরএমএমআরসি) এবং ১৫ জন ছাত্রের তত্ত্বাবধানে শিশুমন্দিরের ভাই-বোন, আচার্য-আচার্যা, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে দধীচি জয়ন্তী উদ্‌যাপন

কলকাতা মহানগরের প্রখ্যাত সেবা সংস্থা মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ৫ সেপ্টেম্বর মানিকতলাস্থিত মহর্ষি দধীচি ভবনে দধীচি জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বেদমন্ত্র-সহ মহর্ষি দধীচি ও মাতেশ্বরী দধিমথীর পূজা করা হয়। দধীচি মহিলা মণ্ডলের ১৫২ জন মহিলা শক্তিদায়িনী মাতেশ্বরীর সংগীতময় স্তব আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হরিপ্রসাদ পালোড়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর বিজয় ওঝা। মুখ্য বক্তারূপে ছিলেন হরিশ তিওয়াড়ী। তিনি মহর্ষি দধীচির ত্যাগ তপস্যার উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের অধ্যক্ষ প্রদীপ সুন্টওয়াল ও সম্পাদক নারায়ণদাস আসোপা।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ট্রাস্টের পূর্ব অধ্যক্ষ রামগোপাল শর্মাকে শাল , শ্রীফল ও মানপত্র সহযোগে সমাজ গৌরব সম্মানে ভূষিত করা হয়। এই সঙ্গে শ্রীমতী কস্তুরীদেবী শর্মাকে পুষ্পস্তবক ও শাল প্রদান করেন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রীমতী মীনু সুন্টওয়াল। সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর রামগোপাল শর্মা সেবাকাজের জন্য ট্রাস্টকে ৫১ হাজার টাকা প্রদান করেন।

এরই সঙ্গে ৩২ জন মেধাবী ছাত্রকে রজত পদক ও মানপত্র দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। পূজায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন শ্রীমহাবীর-কৌশল্যা ভাভড়া। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সরোবর ফেন্ডস ফোরামের অধ্যক্ষ পি এল শাহ, শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বজাজ এবং পারীক সভার অধ্যক্ষ মুলতান পারীক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন বালকৃষ্ণ আসোপা, মালচন্দ্র বেহড়, বাসকৃষ্ণ ওঝা, দেবকীনন্দন পলোড়, নবীন ব্যাস, আশারাম কাকড়া, পবন দায়মা, জয়নারায়ণ দায়মা, ভঁওয়রলাল গোপালপুরিয়া, সুধীর আসোপা, কৃষ্ণগোপাল সুন্টওয়াল, বসন্ত শর্মা, রাজেশ আসোপা, সুরেন্দ্র জোশী, নারায়ণ কাকড়া, দিনেশ শাস্ত্রী, সীতারাম মিশ্রা, ইন্দর কাকড়া, মুকেশ পলোড়, অশোক আসোপা, অনুপমা আসোপা ও ঘনশ্যাম বেহড়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সমিতির বৈঠক

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক বিনায়করাও দেশপাণ্ডে এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পালের উপস্থিতিতে গত ১ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িস্থিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সমিতির বৈঠক হয়। বৈঠকে শ্রীদেশপাণ্ডেজী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও তার বিভিন্ন আয়ামের সাংগঠনিক

বিস্তার, আসন্ন বিভিন্ন কার্যক্রম, বিশেষত আগামী নভেম্বর মাসের হিতচিন্তকঅভিযান নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীপাল বলেন, বর্তমান সময়ে পরিস্থিতির ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে এবং সংগঠনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। সেজন্য সংগঠনের কাজে পূর্ণকালীন কার্যকর্তা বৃদ্ধির জন্য সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সভাপতি নারায়ণ মণ্ডল, প্রান্ত কার্যকরী সভাপতি উদয়শঙ্কর সরকার, প্রান্ত সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল-সহ প্রান্ত সমিতির সদস্যগণ এবং বিভিন্ন আয়ামের প্রমুখরা।

জোকা স্বামীনারায়ণ মন্দিরে সাধু সম্মেলন

গত ১১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জোকা স্বামীনারায়ণ মন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ প্রমুখ স্বামীজী মহারাজের শততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক সাধু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে কলকাতা কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ১৫০ জন প্রমুখ সাধুসন্ত ও ধর্মীয় প্রতিনিধি এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। কয়েকজন কলকাতার বাইরে থেকে আসেন। ৩৫ জনকে মঞ্চে আহ্বান করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন, মঙ্গলাচরণ ও ভক্তি সংগীতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন, ওড়িশার বেবো বালিয়া আশ্রমের সম্পাদক স্বামী চৈতন্যজী মহারাজ, ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক স্বামী নিত্যরূপানন্দ মহারাজ, চিন্ময় মিশনের স্বামী শ্রীমৎ দিবাকর চৈতন্য মহারাজ, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারী বিবেকভাই, ত্রিবেণীর দণ্ডীস্বামী গৌর রামানুজ মহারাজ, মহানাম সম্প্রদায়ের সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী, দক্ষিণেশ্বর যোগদা সৎসঙ্গ

সোসাইটির স্বামী অচ্যুতানন্দ মহারাজ, রামরাজাতলা শঙ্কর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, বারাসাত শঙ্কর বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিবোধানন্দ মহারাজ, বেদান্ত সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল বিরাটির স্বামী অচ্যুতানন্দ মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কলকাতার স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ, ইসকন গুরুকুলের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ভক্তিঅর্ণব প্রীতিবর্ধন মহারাজ, দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরের প্রধান ট্রাস্টি কুশলবরণ চৌধুরী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বেলুড়ের সহ সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ, বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের সহ সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী বরানগর কেন্দ্রের শ্রী দীপঙ্কর ভাই, সভাপতি ঃ সদ্‌গুরু বিবেকসাগর দাস মহারাজ, গুজরাট এবং জোকা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষয়নন্দন দাস মহারাজ।

মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আলমবাজার মঠের স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ, বাহির খণ্ড বৈদিক বর্ণাশ্রম মঠের শ্রীমৎ প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ভবানীপুর ভোলাগিরি আশ্রমের স্বামী বিপ্রানন্দ(বিষ্ণু) মহারাজ, বারাসাত কাজীপাড়া শঙ্করমঠের স্বামী প্রকাশানন্দ গিরি, ডুমুরদহ উত্তম আশ্রমের স্বামী তিতিক্ষানন্দ মহারাজ, সুখচরের শ্রীমৎ পার্থসারথি দাস কাঠিয়াবাবা, পলতার শ্রীমৎ আনন্দগোপাল দাস বাবাজী, সুখচর ভবাপাগলা আশ্রমের স্বামী সোমেশ্বরানন্দ গিরি, বালিগঞ্জ গ্রাম্য যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ মুরারী ব্রহ্মচারী, বালিগঞ্জ গীতাপ্রচার মণ্ডলীর শ্রীমৎ গোবিন্দ মহারাজ, বরানগর শ্রীশিবানন্দ যোগাশ্রমের স্বামী অখণ্ডানন্দ সরস্বতী, শ্রীশ্রীসুদর্শন মন্দির নবদ্বীপের শ্রীমৎ রাতুল গোস্বামী, কৈকালা মানব কল্যাণ সঙ্ঘের স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ সহ সভাপতি চন্দ্রনাথ দাস, তেঘরিয়া শ্রীশ্রীলোকনাথ মন্দিরের সম্পাদক হরিপদ ভৌমিক, চাকলা শ্রীশ্রীলোকনাথ মন্দিরের সভাপতি নবকুমার দাস, কচুয়া শ্রীশ্রীলোকনাথ মন্দিরের সম্পাদক তুষার কুমার বসাক, মহানির্বাণ মঠের স্বামী ভাস্করানন্দ অবধূত, যাদবপুর কৈবল্যধামের কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ গোস্বামী, হাওড়া লালবাবা আশ্রমের স্বামী গুরুপ্রসাদজী মহারাজ, বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের করুণাপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, নাকতলা শ্রীগুরু সঙ্ঘের স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী, নবদ্বীপ মহানাম মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ জগত্তারণদাস ব্রহ্মচারী, বাংলাদেশ ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনধামের শ্রীমৎ দেবার্ঘ্যবন্ধু ব্রহ্মচারী, তারাপীঠের ব্রহ্মচারী দীপেন এবং অনুকূল ঠাকুর সৎসঙ্গ আশ্রমের প্রতিনিধি।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী। অনুষ্ঠান অন্তে সকলকে বস্ত্র, ফল মিষ্টি ও সম্মাননা-সহ প্রসাদে আপ্যায়িত করা হয়।

শিবপুরে স্বাধীনতা ৭৫ বর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির সম্মান সমারোহ

মেয়াদ শেষ হলেও 'স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি, হাওড়া' কিন্তু নিজেদের কাজে ইতি টানছে না। শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি হলে আয়োজিত 'সমাপন সমারোহ'-এ এই আভাস দেওয়া হয়। বলা হয়, অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে বছরভর সমিতির নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচিতে যেরকম সাড়া মিলেছে তাতে এটা স্পষ্ট যে, পরিকল্পিত প্রয়াস চালালে নতুন প্রজন্মের অন্তরে দেশাত্মবোধের স্ফূরণ ঘটানো সম্ভব। যা স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরে নানা কারণে কিছুটা ক্ষীয়মাণ। সমিতির অঙ্কন, নৃত্য, সংগীত বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে দেশাত্মবোধক বিষয় দেওয়া হলেও প্রতিযোগীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎকর্ষের প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে।

সমিতির সভাপতি রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে উদ্দেশ্যে এই সমিতি গড়া হয়েছিল তা পূরণের জন্য ভিন্ন নামে হলেও কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক অধ্যাপক ড. পূরবী রায় তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুতত্ত্বকে নস্যাৎ করেন এবং মুখার্জি কমিশনের রায়কে সরকারিভাবে স্বীকৃতির দাবিতে 'দিল্লি চলো'-র ডাক দেন। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদাত্ত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সম্পাদক অমিত সাঁতরা বর্ষব্যাপী কর্মসূচির বিবরণ পেশ করেন। সংগীত ও আবৃত্তি করেন যথাক্রমে শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ও প্রবীর ভট্টাচার্য। সংস্কার ভারতীর সদস্যরা কয়েকটি দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন।

সমিতি আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে স্থানাধিকারী ৫৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সাংস্কৃতিক অখণ্ড ভারত, বর্তমান ভারত ও অবন ঠাকুরের ভারতমাতার প্রতিকৃতি সম্বলিত স্মারক এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিবেকানন্দ সম্পর্কিত একটি বই।

প্রতিযোগিতার পরদিনই বক্তৃতায় দ্বিতীয় ও প্রবন্ধে প্রথম স্থানাধিকারী দিব্যাঙ্গ ছাত্র অভ্রদীপ ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুর খবর অনুষ্ঠানের আনন্দকে কিছুটা ম্লান করে দেয়। প্রণব রক্ষিতের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর 'জনগণমন' গেয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

কিষাণ সঙ্ঘের বলরাম জয়ন্তী উদ্‌যাপন

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২ সেপ্টেম্বর গাজোল সঙ্ঘ কার্যালয়ে ভগবান বলরাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বলরাম পূজার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন কিষাণ সঙ্ঘের মালদহ জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস। ভোগ নিবেদন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গাজোল খণ্ড সম্পাদক অনুপম গোস্বামী। সংগীত পরিবেশন করেন সঞ্চিতা মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন পরেশচন্দ্র সরকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ধন্যবাদ জানান চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস।

সংস্কার ভারতীর সংহতি ও লোক উৎসব

গত ৩ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার সংস্কার ভারতী কৃষ্ণনগর শাখার উদ্যোগে কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্র মঞ্চে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর উপলক্ষ্যে সংহতি ও লোক উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংস্কার ভারতীর প্রদেশ কার্যকর্তা সুভাষ ভট্টাচার্য। ৮০ জন শিল্পীর নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি এবং নৃত্যগীতি আলেখ্য পরিবেশনায় সভাগার মুখর হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নদীয়া জেলার শিল্পী ও সাংস্কৃতিক প্রমুখ ডাঃ ঋত্বিক তলাপাত্র।

সমাজসেবা ভারতীর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি অমৃতমহোৎসব উপলক্ষ্যে তাম্রলিপ্ত জেলার (সঙ্ঘের দৃষ্টিতে) ময়না খণ্ডের পাঁচপুকুরিয়া শাখাতে সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে মানব সেবায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন-সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশে জয়ধ্বনির মাধ্যমে এই সেবাকাজের সূচনা হয়। তারপরে তমলুক ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় ১৫ জন মাতৃশক্তি-সহ মোট ৪৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। রক্তদাতাদের হাতে একটি করে ফলকর গাছ ও শ্রীমৎভগবত গীতা তুলে দেওয়া হয়। এই মহতি কাজের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ময়না বিধান সভার বিধায়ক-সহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কার ভারতীর জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

সংস্কার ভারতী মেদিনীপুর চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৯ আগস্ট মেদিনীপুর শহরের শহিদ প্রদ্যোত স্মৃতি সদনে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ১৪ আগস্ট আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২৬০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডাঃ সুহাস রঞ্জন মণ্ডল। বিশেষ অতিথিরূপে ছিলেন ডাঃ রবিশঙ্কর ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর জেলা সভাপতি পূর্ণেন্দু মাঝি, জেলা সম্পাদক শ্রীমতী মিতা ঘোষ, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আশিস কর্মকার, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী সবিতা সাহা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নগর সঙ্ঘচালক মৃগাঙ্কশেখর মাইতি, নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক লহর মজুমদার প্রমুখ। শ্রীমাইতি শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত ও জন্মাষ্টমীর গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শ্রীমাঝি কৃষ্ণ ভাবনা এবং বর্তমান সমাজে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। দেবকুমার পণ্ডা সংস্কার ভারতীর বর্তমান সময়ে ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ঝড় জল উপেক্ষা করে যাঁরা 'কৃষ্ণ সাজো' প্রতিযোগিতায় নিজেদের সন্তানকে অংশগ্রহণ করাতে এসেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানান।

আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীরা এদিন আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। খুব সুন্দরভাবে সংগীত পরিবেশন করেন ঋদ্ধিমান পণ্ডা, অদিতি সিনহা, দীপশ্রী দে, রবি প্রামাণিক ও আশিস কর্মকার। পায়েল দাসগুচ্ছাইত ও অরূপ চ্যাটার্জি 'জন্মান্তর' কবিতা আবৃত্তি করেন। শ্রীমতী নবনীতা বসুর ছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। পুষ্পিতা বর্মন ও দীনেশ দে'র কণ্ঠে সংগীত পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তপন সামন্ত, শ্রীমতী বৃষ্টি মুখার্জি ও শ্রীমতী দীপান্বিতা জানা।

কালিয়াগঞ্জ চর্চাকেন্দ্রের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব ও অখণ্ড ভারত দিবস উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতী উত্তর দিনাজপুর জেলা সমিতির কালিয়াগঞ্জ চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে স্থানীয় রেলস্টেশন চত্বরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার পুরপিতা রামনিবাস সাহা। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন রেলস্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার সঞ্জয় কুমার। ছিলেন সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি সঞ্জয় নন্দী এবং সাধারণ সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন রামবিলাস সাহা ও সঞ্জয় কুমার। সঞ্জয় নন্দী সংস্কার ভারতীর রূপরেখা তুলে ধরেন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে। উত্তর দিনাজপুরের দুটি চর্চাকেন্দ্র রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ তাদের সুপরিকল্পিত ও মনোরম অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। কালিয়াগঞ্জ চর্চাকেন্দ্র সংগঠনগত ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও স্থানীয় শিল্পীদের একক পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। এছাড়া নজর কাড়ে কালিয়াগঞ্জের দুই সারদা শিশুতীর্থের ছাত্র-ছাত্রীদের দলগত পরিবেশন।

বিশ্বে আবিষ্কৃত অর্ধেক মৌলিক কণারই নামকরণ হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের নামে

দীপক খাঁ

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবদ্দশায় তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, সমাজ ও স্বদেশ চিন্তা এবং জীবনদর্শনের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। সেই প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে নানাভাবে হয়েছে, শুধু দেশে নয় বিদেশেও। তাঁরই মৌলিক তত্ত্বকে প্রয়োগ করে কয়েকজন বিজ্ঞানী আরও অনেক তত্ত্বের রূপায়ণ করেছেন, লাভ করেছেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সর্বোচ্চ শিরোপা 'নোবেল পুরস্কার'। আমাদের সান্ত্বনা যতদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকবে 'বোসন' কণার মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথ বসু চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমাদের জাতীয় পতাকা জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চে তুলে ধরবার জন্য যদি আমরা মিলিতভাবে চেষ্টা করি, তাহলে ছোটোখাটো ভুল বুঝাবুঝি ও নির্বোধ ঈর্ষা নিশ্চিত ভাবেই সহজে দূর করা যাবে। কেবলমাত্র বিদ্যার্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং বংশ মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রচার করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত মানুষই যে পরম সত্য আমাদের সেই জ্ঞান হোক— এই ছিল সত্যেন বসুর মানসিকতা। সত্যেন্দ্রনাথের কথা প্রসঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানী ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব জয়ন্ত বসুর একবার একটি প্রশ্ন ছিল— 'আপনি নিজেও মেঘনাদ সাহা, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, আপনার সমসাময়িক এই সব শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে অনেকেই যে পরবর্তী জীবনে দিকপাল বিজ্ঞানী হয়েছেন, বিজ্ঞানের আকাশে

একসঙ্গে এতগুলি জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব আমাদের দেশের ইতিহাসে আর নেই বললেই চলে। আপনাদের কৃতিত্বের পিছনে অনুপ্রেরণা কী ছিল?' সত্যেন্দ্রনাথের সহজ উত্তর, 'দেখ, আমাদের মনে হতো সাহেবরা যা পারে, আমরা তা পারব না কেন? বিজ্ঞানে আমরা যে সাহেবদের চেয়ে কম নই, তা দেখিয়ে দিতে হবে।' বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগৎসভায় ভারতকে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করবার বাসনাই ছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর সতীর্থদের প্রেরণার উৎস। তাঁর কৈশোর কেটেছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। তার নিজের কথায় কিশোর বয়সে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি— রাখিবন্ধনের গান গেয়ে অনুভব করেছি, ভাই ভাই আমরা সকলে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ভারতমাতার সন্তান। দীন ভারতমাতার দুঃখ দূর করতে হবে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে হবে— বিদেশির শোষণ নীতি থেকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে পুরাতন ঐতিহ্যসম্পন্ন একটা মহাজাতিকে। তাদের সেকেলে বংশধরদের মধ্যে বর্তমানের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে— নিরক্ষরতা দূর করতে হবে।' সার্থকভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করাই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের

সাধনা।

বোস সংখ্যায়ন রচনার অল্পকাল পরে সত্যেন্দ্রনাথ যখন বিদেশ যান, নিজে মূলত তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী হলেও তখন ফ্রান্সে কয়েক মাস প্রথমে মাদাম কুরির ও পরে মরিস দ্য ব্রগলির সুপ্রসিদ্ধ পরীক্ষাগারে কর্মরত ছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, স্বদেশে পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে তাঁর এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরবর্তী কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। এ বিষয়ে তিনি স্বনির্ভরতার পক্ষপাতী ছিলেন।

জীবনের শেষ ভাগে সত্যেন্দ্রনাথ যে মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর মূলে ছিল দেশের মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর ভালোবাসা। তিনি বলেছিলেন, 'এটা ঠিক যে দেশ বলতে যদি দেশের মানুষকে বোঝায়, শুধু শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয় দেশের সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো দেশকে উন্নত বলা যাবে।'

'বিজ্ঞানের সংকট' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ সনাতনী পদার্থবিদ্যার সংকট বিষয়ে আলোচনা করেছেন সহজ, সাবলীল ভাষায়। একদিকে আলো তথা সাধারণ ভাবে বিকিরণের, অন্যদিকে ইলেকট্রনের তথা সাধারণভাবে বস্তুকণার যে দ্বৈতরূপের কথা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জানা গেল— অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের রূপ ও বিচ্ছিন্ন কণার রূপ— সনাতনী পদার্থবিদ্যার ভিতকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই বিষয়টিই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উপজীব্য। এই প্রবন্ধ প্রকাশের চার বছর পরে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'আইনস্টাইন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

বাল্যকাল থেকেই সংগীতের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীতের বহু আসরে তিনি সাগ্রহে উপস্থিত থেকেছেন। তিনি সংগীতের একজন খাঁটি সমঝদার ছিলেন। তাঁর বন্ধু খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়ের মতে ভালো গান শোনামাত্র তিনি ভালো বলে চিনে নিতে পারতেন। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সংগীত বিষয়ক তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থটি রচনা করার সময় তাঁর কাছ থেকে নানান পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে এসরাজ ভালো বাজাতে পারতেন। এই বাজনা তিনি শুরু করেছিলেন যখন তাঁর বয়স কুড়ি-একুশ বছর। সত্যিকারের সংস্কৃতির লক্ষণ হচ্ছে মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা। কেবল উপদেশ দিয়েই নয়, অকুণ্ঠ হস্তে তিনি কতজনকে অর্থসাহায্য করেছেন, তার বোধহয় ইয়ত্তা নেই।

বোস সংখ্যায়ন রচনা ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ আর যে-সব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা। মহাকর্ষ বল, বিদ্যুৎচৌম্বকীয় বল, নিউক্লীয় বল ও ক্ষীণ বল— এই যে চাররকম বলের কথা বিজ্ঞানে জানা আছে, এগুলির প্রত্যেকটির প্রকৃতি আলাদা-আলাদা সূত্র দিয়ে নির্দিষ্ট হয়। আইনস্টাইন চেষ্টা করেছিলেন এমন একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, যার সূত্র দিয়ে চার রকম বলের প্রকৃতিকে একত্রিত ভাবে প্রকাশ করা যাবে। এই তত্ত্বকেই বলা হয় 'একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব'। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন নতুন ভাবে এই তত্ত্বের যে অবতারণা করলেন, তাতে এগোতে হলে ৬৪টি সহ-সমীকরণের সমাধানের প্রয়োজন দেখা গেল। এই সমাধান এত দুরূহ যে, আইনস্টাইন নিজে এবং এরভিন প্রোয়েডিংগার প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা এতে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। ১৯৫২ সালে সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলে তিনি ৬৪টি সমীকরণের পরিবর্তে দুটি ভাগে ৪০টি এবং ২৪টি সমীকরণের সাহায্যে সমস্যার সমাধান করেন। একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পাঁচটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এইভাবে সমস্যার সমাধানে গণিতে উচ্চমানের পারদর্শিতা লক্ষ্য করা গেলেও পদার্থ বিজ্ঞানের দিক থেকে এ সমাধান যথেষ্ট অর্থবহ বলে বিজ্ঞানীমহলে সাধারণ স্বীকৃতি পায়নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, সাম্প্রতিককালে 'একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্বের' প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও এখনও এই তত্ত্বের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়নি।

সত্যেন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত বোস সংখ্যায়নের সূত্র ধরে একাধিক বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে তাঁর অবদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে না, প্রশ্ন ওঠে নোবেল কমিটির বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে। তবে বিশ্বের তাবৎ মৌলিক কণারই অর্ধেকের নামকরণ হয়েছে যাঁর নাম অনুযায়ী, তাঁর এর চেয়ে বড়ো পুরস্কার আর কী হতে পারে? কেবল গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে নয়, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়েও সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল এবং ওইসব বিষয়ে গবেষকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাঁদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিতের 'পেরিয়ে এলাম' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়নের গবেষণায় সত্যেন্দ্রনাথ কী গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে সালফোনামাইড অণুর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কিত একটি রাসায়নিক সমস্যার তিনি এমন ভাবে সমাধান করেছিলেন যে, তাকে কাজে লাগিয়ে একটি ভেষজ যৌগ প্রস্তুত করা সম্ভব হয় এবং সেটিকে ব্যবহার করা হয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে।

জীবনের শেষ ভাগে তিনি বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে হিলিয়াম সংগ্রহে অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়কে অণুপ্রাণিত করেছেন। অসামান্য বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হিসেবে নির্বাচিত হন। বিশ্বভারতী থেকে 'দেশিকোত্তম' সম্মাননায় ভূষিত হন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হয় 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি। ▮

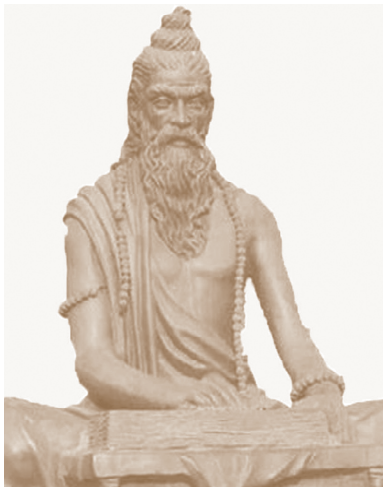

সাংখ্যদর্শনের ফলিত রূপকল্প যোগদর্শন

কৃষ্ণচন্দ্র দে

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রণেতা। যোগ অর্থ কাজ করার কৌশল বা প্রণালী। গীতায় ভগবান বলছেন, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। সংক্ষেপে বলা যায় বিষয়ে আকৃষ্ট মানুষ ভগবৎ চিন্তা বা ভগবান কেন্দ্রীক চেতনা থেকে দূরে সরে গেলে যে উপায়ে তাকে আবার ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাই এক কথায় যোগ। যোগ অর্থ একটা প্রচেষ্টা মাত্র। আরও একটু প্রকাশ করে বললে বলতে হয় পুরুষ ও প্রকৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে, তাকে বিযুক্ত করার প্রয়াসই যোগ। আত্মা প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তখনই অপ্রকৃতের বিলোপ ঘটে। ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী বৃত্তিগুলি ও মনকে কঠোর ভাবে সংযত করার প্রচেষ্টাই পতঞ্জলির যোগ বা সমাধি। ঈশ্বরের যে অসীম শক্তি তাকেই গীতায় যোগশক্তি বলা হয়েছে। এবং তাই ঈশ্বরকে যোগী বলা হয়েছে।

দৈহিক ও মানসিক কতগুলি কর্ম ও বৃত্তিকে সংযত করে পূর্ণতা লাভের একটি সুশৃঙ্খল কৌশল বা প্রণালী পতঞ্জলির দর্শনে দেখা যায়। কপিল মুনি তাঁর সাংখ্যদর্শনে যে দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে গিয়েছেন পতঞ্জলি তাঁকে জীবনে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পতঞ্জলি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। বুদ্ধদেবের পরবর্তী প্রজন্ম। আত্মা পরমাত্মার অংশ স্বরূপ। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই জীবের একমাত্র উপায়, যা অহং বা আমিত্বকে নষ্ট করে জীবকে মুক্ত করে। কপিল বলেন— পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞানে ইহা সম্পূর্ণ হয়।

পতঞ্জলি বলেছেন ব্রহ্মে নির্ভর করতে পারলে এটা হয়। ব্রহ্ম নির্ভরতাই হলো জ্ঞান, চিন্তা, ধ্যান ও ধারণা মুক্তির প্রধান সোপান। জ্ঞান থেকে নির্ভরতা আসে, নির্ভরতা এলে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং ঈশ্বরে মিশে যাওয়া যায়। মানব জীবনে অনেক বিপদাপদ আছে যেমন— রোগ, আলস্য, সন্দেহ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল বিপদাপদ যাতে না হয় ও কীসে জ্ঞানলাভ ঘটে তার কতগুলি উপায় সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। পাতঞ্জল দর্শন সাধারণত চার ভাগে বিভক্ত। যথা : যোগপাদ সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। সাংখ্যদর্শনে যে প্রকার পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে পাতঞ্জল দর্শনে তদ্রূপ ষড়বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং এর চরমতত্ত্ব পরাৎপর পরমেশ্বর। এই সাধনপাদ আট ভাগে বিভক্ত। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি।

যম অর্থে সহিষ্ণুতা, নিয়ম অর্থে ধর্মাচরণ, আসন অর্থে উপবিষ্ট হওয়ার প্রণালী, প্রাণায়াম অর্থে শ্বাস প্রশ্বাস গতি বিচ্ছেদ, প্রত্যাহার অর্থে ইন্দ্রিয় সকলকে বশে আনয়ন, ধ্যান অর্থে ঈশ্বর চিন্তন, ধারণা অর্থে চিত্তস্থিরকরণ এবং সমাধি অর্থে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে তন্ময় হওয়া। এই আট প্রকার সাধনার দ্বারা অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। এই সিদ্ধিকে ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি বলা হয়। যথা : ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান, দুরস্থ দ্রব্যাদি দর্শন, পশু-পাখির শব্দে অর্থবোধ, অন্তরীক্ষে বিচরণ, অন্তর্হিত হওয়া প্রভৃতি ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করা যায়।

একথা মনে রাখতে হবে যে কেবল ক্ষমতালাভই যোগের উদ্দেশ্য নয়। যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্মিলন। এ সকল ক্ষমতা লাভে যিনি অহংকারে আত্মবিস্মৃত হন তিনি যোগভ্রষ্ট হন।

এই যোগে যাদের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে তারা জ্ঞান যোগের অধিকারী এবং যাদের চিত্তশুদ্ধি হয়নি তারা ক্রিয়াযোগের অধিকারী। কৈবল্য অর্থাৎ নির্বাণ মুক্তিই এই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দর্শন মতে স্ফটিক যেমন স্বভাবত শুভ্র, তেমন জীবও স্বভাবত চিন্ময়। কেবল অজ্ঞানতাবশত আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি হর্তা, আমি কর্তা ইত্যাদি দোষে দুষ্ট হয়।

সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূরে সরে যায় তেমন তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতার পর্দা সরে যায়, চিন্ময়ী স্বরূপই বর্তমান থাকে। উপসংহারে একটা কথা বলা জরুরি যে যারা প্রকৃত যোগাভিলার্থী তাঁরা প্রথমে গুরু অন্বেষণে তৎপর হন। পরে তাঁরা উপদেশানুসারে সকল কাজ করবেন। সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে সিদ্ধিলাভ সম্ভব এবং অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা বশিত্য কামাবসাইত্ব এই অষ্টবিধ সিদ্ধিলাভ হয়। □

গুরু অর্জন দেব
শিখ ধর্মের অন্যতম স্তম্ভ

কৌশিক রায়

সুমহান শিখ ধর্মের সূত্রপাত ঘটেছিল গুরু নানক দেবের মাধ্যমে। তবে, এই শিখ ধর্মকে আরও পরিশীলিত করে তোলেন শিখ গুরুরা। মানবাধিকার স্থাপনা, সহনশীলতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে শিখ ধর্মমত এক ব্যাপক প্রসারলাভ করে। তবে, শিখ ধর্মমতের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন ১৫৬৩ সালে পঞ্জাবের অমৃতসরে জাত পঞ্চম গুরু অর্জন দেব। শিখ সম্প্রদায়কে এক দৃঢ়, প্রশাসনিক বন্ধনে সুসংহত করেন গুরু অর্জন দেব।

পঞ্জাবের অমৃতসরে অবস্থিত স্বর্ণমন্দির বা হরমন্দির সাহিবের নির্মাণ গুরু অর্জন দেব শুরু করেন ১৫৮৮ সালে। মন্দিরটির সরোবর, তরণতারণ অঞ্চলে তিনি তৈরি করা শুরু করেন ১৫৯০ সালে। ১৫৯৪ সালে জলন্ধর বা কর্তারপুর শহরটির এবং ১৬০৩ সালে রামসার শহরটির নির্মাণ শুরু করেন গুরু অর্জন দেব। হরমন্দির সাহিব-এর মূল গৃহের জন্য দুটি দরজা নির্মাণ করেন গুরু অর্জন দেব। চারটি দরজার অর্থ— সব রকম আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের জন্য উদারভাবে চিরকালই উন্মুক্ত থাকবে হরমন্দির সাহিব। গুরু অর্জন দেবের অনুরোধে হরমন্দির সাহিবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন বিখ্যাত ইসলামি সুফি সাধক— হজরত মিঞা মির। ১৬০৪ সালে স্বর্ণমন্দিরের গর্ভগৃহে শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থসাহিবের পুণ্যময় স্থাপনা করেন গুরু অর্জন দেব। তিনি আদি গ্রন্থের মধ্যে ৫ জন শিখ গুরু, ১৫ জন হিন্দু ও ইসলামি সাধকের অমৃতময় বাণী চয়ন করিয়েছিলেন। এই সাধকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মুচি, ভিস্তিওয়ালা, কৃষক, কসাই, বাদ্যযন্ত্রী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষ। গুরু গ্রন্থসাহিবের এই বৈচিত্র্যময় প্রকরণ মোগল

সম্রাট আকবরকে বিমুগ্ধ করেছিল।

গুরু অর্জন দেব নিজেই ছিলেন একজন স্বনামধন্য দার্শনিক, অধ্যাত্মবাদী ও মরমিয়া কবি। আদি গ্রন্থসাহিবে তাঁর লেখা প্রায় ২০০০টির বেশি কবিতা আছে। কবিতাগুলিতে মানবাত্মার সঙ্গে দিব্যাত্মার মেলবন্ধনের কথা বলা আছে। আর আছে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধন এবং মানুষদের মধ্যে একাত্মবোধের আদর্শ। ঈশ্বরভাবনাতে রত থাকলে দুঃখ বেদনা যে মানব জীবনকে স্পর্শ করতে পারবে না সেটা গুরু অর্জন দেব বলেছিলেন। ধ্যানমগ্ন হলে মৃত্যুভয়কে এড়ানো যাবে— তা গুরু অর্জন দেব উল্লেখ করেছিলেন। লিঙ্গবৈষম্য উপেক্ষা করে বিশ্বধর্মের পালনের প্রতি গুরু অর্জন দেবের আমৃত্যু অনুরাগ তাঁকে শিখগুরুদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল।

শুধু ধর্ম প্রচারই নয়, পঞ্জাবের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষদের উন্নতির জন্য অনেক সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন গুরু অর্জন দেব। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির সময় তিনি জলকষ্ট নিবারণের জন্য কূপ খনন করিয়েছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরকে বলে গুরু অর্জন দেব ভূমিকরও লাঘব করিয়েছিলেন। তবে আকবরের পুত্র ও কট্টরপন্থী সম্রাট জাহাঙ্গিরের সঙ্গে গুরু অর্জন দেবের সংঘাত শুরু হয়। গুরু অর্জন দেবের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে মেনে নিতে পারেননি জাহাঙ্গির। গুরু অর্জন দেবকে বন্দি করে লাহোরে আনা হয় ১৬০৬ সালে। জাহাঙ্গিরের নির্দেশে অর্জন দেবের ওপর চরম অত্যাচার শুরু হয়। আগুন জ্বালিয়ে উত্তপ্ত কড়াইয়ের ওপর তাঁকে বসতে বলা হয়। তাঁর মাথার ওপর ঢেলে দেওয়া হয় আগুনে গরম বালি। বেশ কয়েকদিন যাবৎ চলে এই নারকীয় অত্যাচার। গুরু অর্জন দেবের সারা দেহ হয়ে পড়ে ক্ষতবিক্ষত ও ফোস্কাতে ভরা। এরপর তাঁকে বাধ্য করা হয় রাভি নদীর ঠাণ্ডা, খরস্রোতা জলে স্নান করতে। এর ফলে দেহান্ত হয় তাঁর। তাঁর মৃত্যু শোকাভিভূত করে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদেরও। গুরু অর্জন দেবের পর মাত্র ১১ বছর বয়সে শিখদের প্রধান হন গুরু হরগোবিন্দ। তিনিই গুরু অর্জনদেবের আদর্শে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকেই অকাল তখ্‌তের প্রতিষ্ঠা করেন। হরগোবিন্দের সময় থেকেই মোগলের হাত থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য শিখরা পদাতিক, অসিযোদ্ধা ও অশ্বারোহী বাহিনী রাখার প্রচলন করেন।

মাত্র ৪৩ বছরের ইহজীবন ছিল গুরু অর্জন দেবের। ২৫ বছর ধরে তিনি শিখদের গুরু ছিলেন। ঈশ্বরের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বর উপাসনার মূলমন্ত্র। গুরু অর্জন গুরু গ্রন্থসাহিবের মধ্যে মুসলিম একেশ্বরবাদ, খ্রিস্টীয় ভাবনা, কবীর-রামানন্দের প্রেমময় বাণীসমূহকে সংকলন করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বকে তিনি একটি বিশাল, একক পরিবার রূপে দেখেছিলেন। বিশ্ব মানবতার প্রতি এক পবিত্র দায়িত্ববোধকে তৈরি করেছিলেন তিনি— যা তাঁকে চৈনিক দার্শনিক কনফুশিয়াস ও লাও-ৎজে, শিটো ধর্মের প্রবর্তক কোমো-দাই-শি, সেন্ট বেনেডিক্টের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছে।

সন্ত্রাসবাদীর মতো কথা বলছেন অভিষেক

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

‘গোলি মার ভেইজেমে
ভেইজা শোর করতা হ্যায়
ভেইজেকা শুনেগা তো মরেগা কাল্লু মামা...’

রামগোপাল ভার্মার ‘সত্য’ ছবির সুপারহিট গান ছিল। মজার দৃশ্য, মজার সব হাবভাব ভঙ্গিমা। কিন্তু কেউ যদি প্রকাশ্যে সাংবাদিক ও ক্যামেরার সামনেই বলে— মাথায় গুলি করতাম, কেমন শোনাবে। মনে হবে না আমরা কি কোনো গণতান্ত্রিক সভ্য ব্যবস্থায় রয়েছি? অথচ ঠিক এমনটাই তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির ১৩ সেপ্টেম্বর নবান্ন অভিযান এবং তাকে কেন্দ্র করে সর্বত্র বেহুলার বাসর ঘরের মতো পুলিশের কড়া বেষ্টনী, অগণতান্ত্রিক ভঙ্গিতে একটা রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন যা স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অশান্তি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগটা ঠিক এই রকম, পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায় বিজেপি কর্মীদের পিছু নিতে গিয়ে পড়ে গেলে তাঁকে রাজনৈতিক কর্মীরা নির্যাতন করে। বেধড়ক মার মারে নেতা-কর্মীরা। এসএসকেএম হাসপাতালে সেই আহত পুলিশ আধিকারিক তারপর চিকিৎসাধীন ছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পুলিশ আধিকারিককে হাসপাতালে পরিদর্শনের পরেই একহাত নিলেন বিজেপির বিরুদ্ধে। পুলিশ সংযম প্রদর্শন করেছে এবং ‘আমার সামনে কেউ পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করলে মাথায় গুলি করতাম’— এ কোনো আতঙ্কবাদীর কথা নয়, কালচার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভোটে নির্বাচিত একজন সাংসদের ঠাণ্ডা মাথায় রাখা ভাষণ। একটা রাজ্যের পুলিশি অত্যাচার এবং পুলিশকে দলদাসে রূপান্তরিত করা শাসক রাজনৈতিক দলের সুপ্রিমোর ভাইপোর মুখে এই বক্তব্য এটাই প্রমাণ করল পুলিশ আসলে শাসক দলের সন্ত্রাসী ব্যবহারের দোসর।

যে ভঙ্গিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মাথায় গুলি চালানোর কথা বললেন তা এক কথায় সুপারহিট যে কোনো ছবির সুপার ভিলেনের ডায়লগ হতেই পারে। কিন্তু বাস্তবে একটা বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের উদ্দেশে যখন শাসক দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড এমন দুর্বিনীত বক্তব্য রাখেন এবং তাতে প্রবল আত্মবিশ্বাস যোগ হয়, তখন মনে হয় এ কি পশ্চিমবঙ্গের বুকে কোনো ঘটনা, নাকি ইতালির কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলের কোনও ঘটনা? পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশ্যে যেভাবে দিনের পর দিন শাসকদল এবং তার মতদপুষ্ট পুলিশ প্রহরা ও অত্যাচারের গল্প তৈরি হচ্ছে তাতে ১৯২৭-এর ইতালির ফ্যাসিস্ট স্টেটেরই তুলনা চলে। বিরোধী দলের ওপর নজরদারি আর প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক সন্ত্রাসে তাদের কোণঠাসা করার চক্রান্ত একটা রাষ্ট্রকে সেদিন

Facistize সমাজে রূপান্তরিত করেছিল। আজকেও কি পশ্চিমবঙ্গের একই দশা নয়? কারণ মাথায় গুলি মারার নিদান যখন শাসক দলের হোমরা চোমরা কেউ দেন এবং তার পরেও তা নিয়ে তেমন একটা প্রতিক্রিয়া হয় না, পুলিশও লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপটি করে বাধ্য হয়েই চলে, সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর কোনো বিরোধিতা বা সাড়া আসে না— তখন বুঝতে হবে এ রাজ্যে 'গুলির জন্য সমস্ত রাত সমস্ত দিন খোলা...।' পুলিশি অত্যাচার এ রাজ্যে অসংখ্যবার ঘটেছে। ১৯৫৯-র ৩১ আগস্ট ছাত্র শহিদ দিবসে পুলিশ ৮০ জনকে হত্যা করেছিল।

আবার বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় তখন প্রমোদ দাশগুপ্তর উবাচ কুখ্যাত 'পুলিশের গুলিতে কি নিরোধ পরানো ছিল?' —থেকে ২০২০-র জুলাইতে বিজেপির উত্তরকন্যা সফরে পুলিশের গুলি, বারে বারে পুলিশ রাজনৈতিক শাসক দল এবং দুষ্কৃতীকে সমকক্ষে হাজির করেছে। কিন্তু মাথায় গুলির মতো মন্তব্য শাসক দলের দুর্বৃত্তায়নের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, তাঁর এই 'ট্রিগার হ্যাপি' মন্তব্য উস্কানিমূলক এবং এই আচরণে আমাদের সঞ্জয় গান্ধীর কথা মনে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামের ইতিহাসে বহুবার ট্রাম জ্বলেছে। গাড়ি পুড়িয়েছে আন্দোলনকারীরা। তাকে নৈতিকভাবে সমর্থন যেমন করি না, তেমনই তার বিরুদ্ধে গুলি চালানোর প্রকাশ্যে প্ররোচনাও আরও বেশি অন্যায়। বন্দুকের সঙ্গে খুব পরিচিত বিপ্লবপ্রিয় বাঙ্গালি। দেওয়ালে দেওয়ালে একটা সময় লেখা থাকত 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'— তারপর সেই বন্দুক যখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়েদের হাতে এলো তখন তিনি হলেন কুখ্যাত মানুদা। তারপর বন্দুকের দারুণ প্রয়োগ হলো মরিচঝাঁপিতে।

১৯৯৩-এর ২১ জুলাই যুব কংগ্রেসের মহাকরণ অভিযানের দিন জ্যোতি বসুর সরকার যে গুলি চালিয়েছিল তাও নৈতিক বই কি। নৈতিক বলেই না সেদিন যে মনীশ গুপ্তর অর্ডারে গুলি চলেছিল তিনিই আজ তৃণমূল নেতা। সেদিনও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল এমনকী বোমাও ছুড়েছিল বিক্ষোভকারীরা। তাই অভিষেকের 'মাথায় গুলি' নিদান ২১ জুলাই গুলি চালানোর প্রতিবাদে শহিদ দিবস পালনের নৈতিক অধিকার থেকে তৃণমূলকে বিচ্যুত করছে। এবার জিজ্ঞাসা রুল বুক নিয়ে। হ্যাঁ রুল বুকে হয়তো বলা আছে বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ গুলি চালাতে পারে। রুল বুক একটা বিধিসম্মত সতর্কীকরণ। তার হুবহু কখনওই মেনে চলা যায় না, কারণ যখনই লিখিত কিছুর বাস্তবিক প্রয়োগ হয় তখন বাস্তবের নানান ফ্যাক্টরকে হিসেবে আনতে হয়। একটা সরকারকে মানুষের পাল্‌স বুঝতে হয়। এই রাজ্য সরকার মানুষের স্নায়ু বুঝতে অপারগ। তাই বিক্ষোভ হলেই তারা গুলি চালায়। আর হ্যাঁ, রুল বুকের কোথাও মাথায় গুলি করার কথা লেখা নেই। কিন্তু এই রাজ্যের পুলিশ সব পারে। এরাই সরোজ দত্তকে হাওয়া করে দিয়েছিল ময়দানের মাঠে।

তাই যদি মাথায় গুলি করতে অর্ডার দেয় যুবরাজ, নিশ্চয়ই হাত কাঁপবে না পুলিশের। অভিষেক যে সাহস নিয়ে বিজেপির উদ্দেশে মাথায় গুলি করার বার্তা দিলেন ঠিক একই যুক্তি কেন তৃণমূল বিধায়ক তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এবং দলের ব্লক সভাপতি অপূর্ব চৌধুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। মঙ্গলকোটে যখন ২০১৮-র ফেব্রুয়ারিতে পাঁচ দিন ধরে লাগাতার সিদ্দিকুল্লা বনাম অপূর্ব টিমের অশান্তি সংঘর্ষ চলছে তখন তো তারা পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা পর্যন্ত নিক্ষেপ করেছে। সেদিন অভিষেকের 'ম্যাচিওরিটি' কি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল? তাই মাথায় গুলির টোটকা আসেনি। কিংবা অনুব্রত মণ্ডল যখন বলছে পুলিশের মাথায় বোমা মারো বা ওর সামনে মাথা নীচু করে উর্দিধারী পুলিশ যখন 'স্যার স্যার' করছে সে সব ঘটনা সাপেক্ষে কোথায় গুলি করার হুকুম দেবেন অভিষেক। ১১ আগস্ট ২০১৯-এ শীতলকুচিতে যখন রাজনৈতিক সংঘাত চলছে তখনও পুলিশের গাড়িতে বোমা ছোঁড়ে তৃণমূল। পাঁচজন পুলিশ আহত হয়েছিলেন। সেদিন অভিষেকের মাথায় গুলি চালানোর আওয়াজ কোথায় ছিল। মাথায় গুলি— যেখানেই খবরে আসে তার পাশে লেখা থাকে সন্ত্রাসী অথবা দুষ্কৃতী। এই প্রথম লেখা থাকল মাথায় গুলি এবং একজন সাংসদ একটি রাজনৈতিক দলের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পদাধিকারী এবং মুখ। এর সঙ্গে এও বলতে হয়, নন্দীগ্রামে গুলি চলার প্রতিবাদ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

১৪ মার্চ ২০০৭ যেদিন নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে ১৪ জনের মৃত্যু হয়, ধরে নেওয়া হয় সেদিন থেকেই বাম সরকারের শেষের শুরু লেখা হয়ে গিয়েছিল। সেদিনও ম্যাজিস্ট্রেট ওই জমায়েতকে বেআইনি ঘোষণা করলে আইজি উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায়। মমতা সরকার

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

সেই ঘটনাকে নালিফাই করছে অভিষেকের মাথায় গুলি বক্তব্যে। রাজনৈতিক মতাদর্শে হাজার অমিল থাকলেও, মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯৯৭-এর চন্দ্রশেখর প্রসাদের ঘটনা। যিনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের দু' দু'বারের নির্বাচিত ছাত্র সভাপতি। লালুপ্রসাদ তখন বিহারের ক্ষমতায়। চন্দ্রশেখরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগঠন বিহার নিবাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেও উপহার ছিল পুলিশের বুলেট। সেদিনও রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সাংসদ মহম্মদ সাহাবুদ্দিন এবং অন্য আর এক নেতা সাধু যাদব পুলিশকে গুলি চালাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু সাহাবুদ্দিনের কোনো শাস্তিই হয়নি উপরন্তু পরের নির্বাচনেও জয়ী হন। সেই বিহারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে আজকের পশ্চিমবঙ্গ। যদিও পরে সাহাবুদ্দিনের সাজা হয়। ব্রেখটের A poem for Dark Times আজ বড্ড প্রযোজ্য এই রাজ্যের জন্য।

কবি লিখছেন—

'Really, I live in dark times !

innocent words are foolish. An unfurrowed brew

indicates apathy.

He who laughs

just hasn't received yet.

The terrible news

what times are these, in which.

A conversation about trees is almost a crime.

Because it implies silence about so many misdeeds!

নাৎসি অত্যাচারে ধ্বস্ত জার্মানির সংস্কৃতিতে সমাজ যখন মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে তখন কবি ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখছেন। পশ্চিমবঙ্গেও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্রেখটের প্রাসঙ্গিকতার নবীকরণ সম্ভব। মাথায় গুলি আসলে প্রতিবাদের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে শাসনযন্ত্র। ওই শব্দবন্ধ আসলে আধিপত্যকামিতার বার্তা। এর পরিণামে শাসক দল এবং মানুষে সমুদ্র ব্যবধান নির্মাণ হয়। কারণ 'অসংখ্য শিবিরে রুদ্ধ শিবির কামনা করে' রাজ্য গঠন হতে পারে না; একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল চললেও

মাথায় গুলি পুলিশ মারবে কী মারবে না তা সময় বলবে কিন্তু অভিষেকের এই বার্তা আসলে রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য, রাজনৈতিক শাসানি, সীমাহীন দাপট এবং স্বৈরাচারী মনোভাবের হুঁশিয়ারি।

চলতে পারে। অভিষেকের মন্তব্যে বোঝা যায়, শাসকের রক্তচক্ষুকে সরকার জয়োৎসবের নামে আড়াল করছে। ক্ষমতাতন্ত্রবিরোধী স্বর তুঙ্গস্পর্শী। তাই কি মাথায় গুলি করার বার্তা? অভিষেক যেন ভুলে না যান, ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই রাজ্যেই এক সময় লেখা হয়েছিল—

'খুব যদি বাড় বেড়ে ওঠে
দাও ছেঁটে দাও সব মাথা
কিছুতে কোরো না সীমাছাড়া
থেকে যাবে ঠিক ঠাণ্ডা, চুপ'

দাড়িভিটে বাংলা শিক্ষকের প্রয়োজন কিন্তু সরকার মোতায়েন করছিল উর্দু শিক্ষক। সেদিন দুটো বাচ্চা তরতাজা ছেলে রাজেশ আর তাপস প্রতিবাদ করেছিল। পুলিশকে তো আক্রমণ করেনি ওরা। তবে তাদের বুকে কেন পুলিশ গুলি চালাল? রাজদম্ভ ছাড়া আর কোনও উত্তর নেই রাজ্য সরকারের কাছে।

মাথায় গুলি মারো যখন নিরুত্তাপ ভাবে বলা যায় তখন তো ডানা ছাঁটার সময়ও আসন্ন। একদলীয় গণতন্ত্র এক স্বতন্ত্র সত্তা। সে যাকে আশ্রয় করে তাকেই গ্রস্ত করে। পুলিশনির্ভর গণতন্ত্র সরকারের অসংগতিকেই বার বার প্রমাণ করে। বামফ্রন্টের শেষটাও এ ভাবেই হয়েছিল। কবি শঙ্খ ঘোষের ঘৃণা তুঙ্গস্পর্শী হয়ে কলমে জন্ম নিয়েছিল—

'তিন রাউন্ড গুলি খেলে তেইশজন মরে যায়

লোকে এত বজ্জাত হয়েছে।

পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা আমার পুলিশ'

সত্যিই তো পুলিশের আর কী দোষ। 'ভিতরে ভিতরে যার ভর হয়ে উঠেছিল লুম্পেন সমাজ' তাদের ত্রাতাই হয় পুলিশ স্টেট।

বিহারে ১৭ জুলাই ১৯৯৭-এ কমলেশ্বর প্রসাদ জয়সোওয়ালের গায়ে মোতিহারিতে (পূর্ব চম্পারন) পুলিশের বুলেট লাগে। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর চিকিৎসা চললেও তিনি পূর্ণ সুস্থ হন না। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎপরায় উল্লেখযোগ্য ভাবে ২০০৮-এ তাঁকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। অভিষেকের মন্তব্যে যদি প্ররোচিত গুলি ছোটে, তবে প্রত্যেক বুলেটের খেসারত তাঁকেই দিতে হবে। গত ২২ জুলাই ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস অথরিটির কনফারেন্সে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানাও স্পষ্ট করলেন একটি পুলিশ স্টেট কখনও গণতন্ত্র দিতে পারে না। ইউক্রেনের মতোই 'no to police state' ব্যানার দেওয়ার সময় এ রাজ্যেও আসন্ন। মাথায় গুলি আসলে আগাস্তো পিনোচেটের (চিলির ত্রাস) রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের সমকক্ষ সময় নির্দেশ করে। যে রাজ সাম্রাজ্যের নীতিই ছিল 'repression of public liberties, the elimination of political exchange, limiting freedom of speech, abolishing right to strike, freezing wages' —হুবহু পশ্চিমবঙ্গের ছবি। মাথায় গুলি পুলিশ মারবে কী মারবে না তা সময় বলবে কিন্তু এই বার্তা আসলে রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য, রাজনৈতিক শাসানি, সীমাহীন দাপট এবং স্বৈরাচারী মনোভাবের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি। যে হুঁশিয়ারি চোখের বদলে চোখ চায়। 'যে মরে মরুক' কিন্তু জয়ী হতেই হবে এই মনোবৃত্তির সূচক মাথায় গুলির বার্তা। তবে অভিষেককেও মনে রাখতে হবে 'গুলি মারো বললেই গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না'।

ক্ষমতার চশমা দিয়ে বাইরের জগৎ দেখছে স্বৈরাচারী অভিষেকরা

বিমল শঙ্কর নন্দ

'যেভাবে বিজেপি সমর্থকরা পুলিশের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়েছে আমি হলে কপালের মাঝখানে গুলি করতাম'— বক্তা তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জেতা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ, তৃণমূলের 'সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড' 'বাংলার যুবরাজ' বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনের অঘোষিত উত্তরাধিকারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি থাকা কলকাতা পুলিশের এসিপি দেবজিৎ চ্যাটার্জিকে দেখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উক্তি করেন। একই দিনে পূর্ব মেদিনীপুরের প্রশাসনিক সভায় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন 'পুলিশ চাইলেই গুলি চালাতে পারতো। কিন্তু সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁরা যথেষ্ট আত্মসংবরণ করেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে' —এই উক্তির মানে সোজা বাংলায় যেটা দাঁড়ায় তা হলো পুলিশ চাইলেই বিজেপির উপর গুলি চালাতে পারতো। ওদের কপাল ভালো, পুলিশ সেটা করেনি। এর জন্য পুলিশকেই কৃতিত্ব দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই উক্তিগুলোর তাৎপর্য আলোচনা করার আগে উপরের অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত কিছু শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুপ্রিমো বা সেকেন্ডে-ইন-কম্যান্ড শব্দগুলি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। অবশ্যই 'সুপ্রিমো' হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'সেকেন্ড-ইন- কম্যান্ড' হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যেহেতু তৃণমূল দলটির কাঠামো গণতান্ত্রিক নয়, নির্দিষ্টভাবে স্তরবিন্যস্তও নয়, দলটা অনেকটাই অ-আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে চলে, ফলে এই ধরনের দলে 'সুপ্রিমো', 'সেকেন্ড-ইন- কম্যান্ড' প্রভৃতির গুরুত্ব যথেষ্টই বেশি। এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস দলটি যেভাবে সরকার পরিচালনা করে তাতে অতীতের রাজারাজড়াদের কথা মনে পড়ে যায়। এখানে গণতন্ত্রের মোড়কে স্বৈরতন্ত্র বা রাজতন্ত্রই চালানো হয়। আর তৃণমূল কংগ্রেস দল যদি আরও অনেক দিন ক্ষমতায় থাকে (সৌভাগ্যবশত সেটা হবে না) তবে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার কে সেটা অতি সাধারণ মানুষও জানে। তাই 'মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনের অঘোষিত উত্তরাধিকারী' শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ ভুল নয়।

ভারতের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্ব ও প্রভাব অত্যন্ত বেশি। গোটা সামাজিক ব্যবস্থার ওপরেই তাঁদের প্রভাব থাকে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতি তাঁদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তাই কোনো বিষয় নিয়ে তাঁরা যদি বিতর্কিত মন্তব্য করেন তাহলে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ হবেই। 'আমি হলে কপালের মাঝখানে গুলি করতাম'— মন্তব্য যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি করে, সেই বিতর্ক চলছেও।

একটি গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশ প্রশাসনকে দেশের আইন মেনে চলতে হয়। এই আইন আবার গড়ে ওঠে সংবিধানের মূল নীতিগুলির ভিত্তিতে। পুলিশকে অনেক সতর্কভাবে আইন প্রয়োগ করতে হয়, কারণ পুলিশের হাতে প্রাণঘাতী অস্ত্র থাকে। খুব প্রয়োজন ছাড়া সেই অস্ত্রের প্রয়োগ করা যায় না। এ ব্যাপারে পুলিশের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মবিধি তৈরি করে দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অপরাধ প্রতিরোধ এবং অপরাধীদের সম্পর্কে কী নীতি গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় কিউবার হাভানা শহরে। সেই সম্মেলনে স্পষ্ট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত কাজ প্রকৃতপক্ষে একটি সামাজিক কাজ। যারা আইন প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আবার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার যে অধিকার স্বীকার করা হয়েছে সেগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির। যতদিন যাচ্ছে মৌলিক ও সাধারণ অধিকার সংক্রান্ত চেতনা মানুষের মধ্যে বেড়ে চলেছে। এ ব্যাপারে সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকেও সতর্ক থাকতে হয়। দেখতে হবে কোনোভাবেই যেন মানুষের প্রতিবাদ করার অধিকার কিংবা জীবনের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'বলপ্রয়োগ' সম্পর্কে পুলিশের পদ্ধতির বদল ঘটছে। কথায় কথায় গুলি চালানোর ক্ষমতা আর পুলিশকে দেওয়া হয় না। কোনো চরম হিংসাত্মক পরিস্থিতিতে কিংবা ভয়ংকর আক্রমণের মুখে পুলিশ গুলি চালাতে পারে, কিন্তু কখনোই কপাল লক্ষ্য করে গুলি চালানো যায় না। এই পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসের খাদ্য আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠলে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেয়। বামপন্থীরা দাবি করে যে পুলিশের লাঠির ঘায়ে ও গুলিতে ৮০ জন মানুষ মারা গিয়েছিল। এই পরিসংখ্যান অবশ্য সরকার মানেনি। তবে এটা ঠিক যে ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনে বহু মানুষ হতাহত হয়েছিল। ১৯৫৯-এর পর ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারির খাদ্য আন্দোলনেও একাধিক মৃত্যু ঘটেছিল পুলিশের গুলিতে। এদেরই একজন ছিল বসিরহাটের কাছে স্বরূপনগরের স্কুলছাত্র নুরুল ইসলাম, যার মৃত্যুর উদাহরণ টেনে সিপিএম বহুদিন রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছে। বিগত শতাব্দীর ৫০ ও ৬০-এর দশকে বামপন্থীরা একটি স্লোগানকে মিথ বানিয়ে ফেলেছিল। স্লোগানটা ছিল : 'পুলিশ তুমি যতই মারো/মাইনে তোমার একশো বারো।'

বামপন্থীদের কাছে পুলিশ তখন আধাসামন্ততান্ত্রিক আধা বুর্জোয়া শাসনের এক হাতিয়ার। ফলে সে মেহনতি মানুষের শত্রু, শ্রেণীশত্রু। কিন্তু ১৯৭৭ সালে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর বামপন্থীরা পুলিশকে নিয়ে তাদের ভাবনার বদল ঘটিয়ে ফেলে। পুলিশ তখন শ্রেণীশত্রু, গণশত্রু কিছুই নয়। লাল দলগুলোর 'লাল বাংলা' গঠনের যন্ত্র। বাম আমলে পুলিশের বিরুদ্ধে বড়ো অভিযোগ ছিল পুলিশ 'ট্রিগার হ্যাপি' হয়ে উঠেছে। বাম নেতারা বিশেষত সিপিএম তখন গলা ফাটিয়ে পুলিশের কাজকে সমর্থন করে গেছেন। ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত এসইউসি কর্মীদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে মাধাই হালাদার নামে এক এসইউসি কর্মী নিহত হন। এই মৃত্যু প্রসঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উদ্ধৃত উক্তি ছিল : 'ওরা পুলিশের দিকে ইট ছুড়লে পুলিশ কি রসগোল্লা ছুড়বে?'

এসইউসি-র প্রতিবাদ আন্দোলন ভয়ংকর ভাবে হিংস্র হয়ে উঠেছিল এমন কোনো প্রমাণ ছিল না। তারপরও পুলিশের গুলিতে মানুষের মৃত্যুকে সমর্থন করেছিল শাসক সিপিএম। পুলিশকে তখন নয়া বিপ্লবী শক্তির সহযোগী বলেই হয়তো মনে করা হতো। এর তিন বছর পরে ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে যুব কংগ্রেসের মহাকরণ অভিযানে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালানোয় ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী মারা যায়। এই গুলি চালনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠলেও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নিরাসক্ত মন্তব্য ছিল : 'ওরা মহাকরণ দখল করতে আসছিল। পুলিশ গুলি চালিয়েছে।'

যে বা যারা এখন বিজেপি কর্মীদের কপালে গুলির প্রসঙ্গ তুলছেন তাঁরা ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পুলিশের গুলি চালানোকেই ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করছেন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিবের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, 'সেদিন ৩টি বাস পোড়ানো হয়েছিল, ৩৫টি গাড়ি ভাঙচুর হয়েছিল। জখম হয়েছিল ২১৫ জন পুলিশ। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সাব ইন্সপেক্টর এ কে গাঙ্গুলিকে এসএসকেএম হাসপাতালের সামনে মেরে মাথা ফাটিয়ে, হাত ভেঙে দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। আক্রান্ত, রক্তাক্ত হয়েছিল পুলিশ। তাই গুলি চালিয়েছিল'। যে যুক্তি দিয়ে বিজেপি কর্মীদের কপালে গুলি চালানোর নিদান দেওয়া হচ্ছে সেই একই যুক্তিতে ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পুলিশের গুলি চালানোকে সঠিক বলতে হয়। এই ঘটনার পর দু'একটি সংবাদপত্র বাদে প্রত্যেকেই এই আন্দোলনে যে হিংস্রতা দেখা দিয়েছিল তার নিন্দা করেছিল। দি স্টেটসম্যান ২৩ জুলাই ১৯৯৩-এর এক নিবন্ধে এই আন্দোলনকে 'কংগ্রেস (আই) দলের যুব শাখার অপরিণত নেতৃত্বের দ্বারা সংগঠিত পূর্ব পরিকল্পিত হিংস্রতা' বলে বর্ণনা করেছিল। টাইমস অব ইন্ডিয়ার ২৩ জুলাই, ১৯৯৩ সালের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল : 'নৈরাজ্যই পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে।'

১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে এতো মানুষের মারা যাবার ঘটনাকে কোনো ভাবেই সমর্থন করা যায় না। ঠিক তেমনি কোনো দায়িত্বশীল পদে থেকে পুলিশকে কোনো অন্যায় কাজ করতে প্ররোচিত করাও সমর্থনযোগ্য নয়। এই ধরনের কথা শুনে পুলিশ যদি ট্রিগার হ্যাপি হয়ে পড়ে তবে তা গোটা সমাজের পক্ষেই বিপজ্জনক হবে। স্বৈরাচারীরা ক্ষমতার চশমা দিয়ে বাইরের জগৎকে দেখে। ফলে সব কিছুকেই তারা বিচার করে ক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। কিন্তু স্বৈরাচার নয়, শেষ কথা বলে গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে সরকার ও তার প্রশাসনকে এই কাজেই নিজেদের নিয়োজিত করতে হয়। এখানে মানুষের কপালে গুলি করার নিদান দিলে সেই গুলি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কপালে গিয়ে আঘাত করবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা কখনোই কাম্য নয়। □

জানা অজানায় বিদ্যাসাগর

ছোট্ট বন্ধুরা, অসংখ্য গুণের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে মাতা ভগবতী দেবী ও পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে। কার কথা বলছি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। হ্যাঁ, মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। আজ তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি মজার কথা শোনা যাক।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের সময়ের একটি মজার ঘটনা ঃ ছোট্টো বন্ধুরা, এঁড়ে বাছুর তোমরা সবাই দেখেছ। বড়ো একগুঁয়ে হয় এই বাছুর। একদিন ঈশ্বরচন্দ্রর বাবা হাটে গিয়েছিলেন জিনিসপত্র কিনতে। হাট থেকে ফিরে দেখেন তাঁর বাবা বাড়ির দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। ছেলেকে দেখেতে পেয়ে বলে উঠলেন, ঠাকুরদাস, আজ আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে। বাবার কথা শুনে ঠাকুরদাস পা বাড়ালেন গোয়ালঘরের দিকে। বাবা হেসে বললেন, ওদিকে নয়, এদিকে এস। এই বলে আঁতুরঘরে নিয়ে গিয়ে শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে বললেন, এই ছেলে একগুঁয়ে হবে আর আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঃ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়িতে হঠাৎ হাজির হলেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন তিনি কোন দেবতার আরাধনা করেন। উত্তরে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর মাতৃদেবীকে সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করেন বলতেই শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিমুখে বললেন, এতদিন খাল বিল নদী নালা দেখেছি। এবার সাগরে এলাম,

এক কৌতূহলী ঘটনা ঃ বিদ্যাসাগরমশাই সবসময় খুব সাধারণভাবেই থাকতেন। ধুতি পরতেন। গায়ে একখানা চাদর থাকত। পায়ে চটি পরেই সব জায়গায় যেতেন। পোশাকের আড়ম্বর না থাকার জন্য বহু জায়গায় তাঁকে নিয়ে অদ্ভুত ঘটনা ঘটত।

বিদ্যাসাগরমশাই তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। সেই সঙ্গে বঙ্গপ্রদেশের কয়েকটি জেলার স্কুল পরিদর্শকের ভারও ছিল তাঁর উপর। সেই সময়ে তিনি গিয়েছিলেন কোনো এক গ্রামে স্কুল পরিদর্শনে। বিদ্যাসাগরমশাই আসবেন শুনে গাঁয়ের সবাই ভিড় করে জড়ো হয়েছিল স্কুল প্রাঙ্গণে। গিন্নিবান্নিরাও সেই জমায়েত থেকে বাদ যাননি। হঠাৎ রব উঠল, ওই যে বিদ্যাসাগরমশাই আসছেন। বিদ্যাসাগরমশাই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারল না।

এক গিন্নি তার স্বামীকে প্রশ্ন করল, হ্যাঁ গো, বিদ্যাসাগর কই? স্বামী আঙুল দিয়ে বিদ্যাসাগরকে দেখিয়ে দিল। স্ত্রী মুখ ঝামটে বলে উঠল, ও আমার পোড়া কপাল, এই কিনা বিদ্যাসাগর! এই মোটা চাদর গায়ে, উড়ে চেহারা দেখবার জন্য রোদে পুড়ে তেতে মরলাম। এর না আছে গাড়ি, না আছে চোগা চাপকান, হুঁ!

রথ দেখা কলা বেচা ঃ তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি কখনোই ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি দিতে পছন্দ করতেন না। প্রায়ই তিনি ক্লাস চলাকালীন টহল দিয়ে বেড়াতেন। একদিন দেখলেন, এক অধ্যাপকের টেবিলে বেত রাখা। তিনি অধ্যাপককে আড়ালে ডেকে বললেন, টেবিলে বেত রেখেছেন কেন? অধ্যাপক বললেন, ম্যাপ দেখানোর সুবিধার জন্য বেতটি এনেছি।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে। ম্যাপ দেখানোও হবে আর প্রয়োজন হলে ছেলেদের পিঠে দু'ঘা বসানোও যাবে। কী বলেন? একথা শুনে সেই অধ্যাপক মাথা হেঁট করে রইলেন।

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের বিপ্লবী

সন্তোষ কুমার মিত্র

বিপ্লবী সন্তোষ কুমার মিত্র ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট মধ্য কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। ১৯২৩ সালে বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তির পর কংগ্রেস দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কলকাতায় সোস্যালিস্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সূত্রে গ্রেপ্তার হয়ে হিজলি জেলে অবরুদ্ধ হন। জেলে রাজবন্দিদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধ চলছিল। ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর প্রহরীরা রাজবন্দিদের আক্রমণ করতে এলে তিনি বাধা দিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- মোটরগাড়ির হেডলাইটে অবতল কাচ ব্যবহার করা হয়।
- শোয়া অবস্থায় একজন মানুষ পৃথিবীকে সবচেয়ে কম চাপ দেয়।
- ন্যানো সেকেন্ড হলো এক সেকেন্ডের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ।
- বর্ণান্ধ মানুষ লাল,নীল ও সবুজ রং বুঝতে পারে না।
- পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্ত পদার্থ হলো হীরক।
- কালো রঙের কাপে চা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়।
- কাচ তৈরির প্রধান উপাদান হলো বালি।

ভালো কথা

টেক্সাসে গীতাপাঠ

আমাদের দেশ ভারত থেকে ১৪ হাজার ১৬০ কিলোমিটার দূরের একটি শহর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যের ডালাস শহর। সেখানে গত ১৩ আগস্ট ১৫০০ ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে গীতাপাঠ করে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান করে নিয়েছে। এটির আয়োজন করেছিল ওই শহরের অবধূত দত্ত পীঠম নামে একটি সংস্থা। জানা গেছে, সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের এক বছর ধরে ৭০০ জন সংস্কৃতজ্ঞ অভ্যাস করিয়েছিলেন। ভারতের বাইরে ভারতীয় সংস্কৃতির এই জয়জয়কার আমাদের পক্ষে খুবই গৌরবের বিষয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী গিনেস বুকে স্থান পাওয়ার আগেই ওই আয়োজক সংস্থাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

রুদ্রনাথ সিংহ, দ্বাদশশ্রেণী,চুনাভাটি, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভাইয়ের আনন্দ

মধুরিমা পাল, নবম শ্রেণী, বৈষ্ণবনগর, মালদা।

দুর্গাপুজো এল গেল
কালীপুজো আসছে,
কালীপুজোয় ভারী মজা
ভাইটি আমার হাসছে।
কালীপুজোর রাতের বেলা
লক্ষ বাতি জ্বলে,
কালীপুজোর আগের রাতে
প্রদীপ ভাসাই জলে।

কালীপুজো যেই না শেষ
ভাইফোঁটা যে আসে
ভাইকে আমি দিলেই ফোঁটা
হিহি করে হাসে।
তারপরে সে ছোট্টো হাতে
আমায় প্রণাম করে,
সারাটা দিন ভাইয়ের আমার
আনন্দ আর না ধরে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

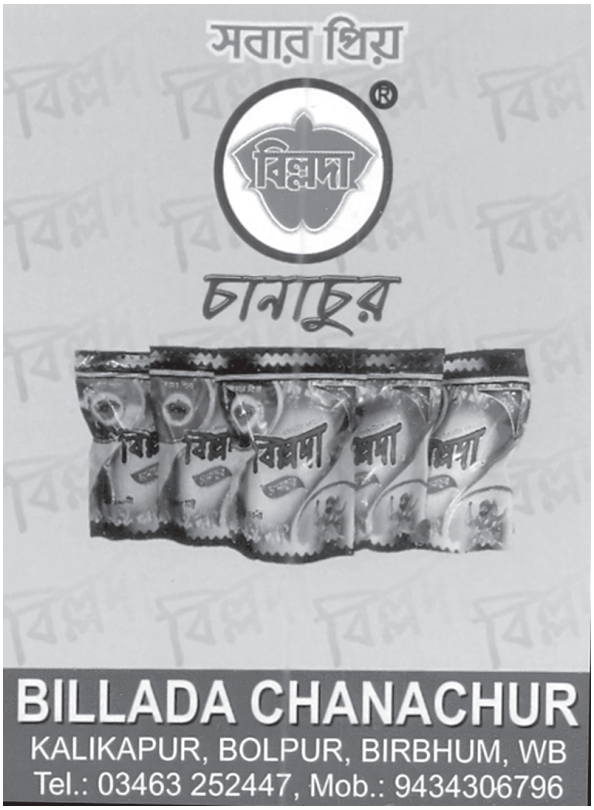

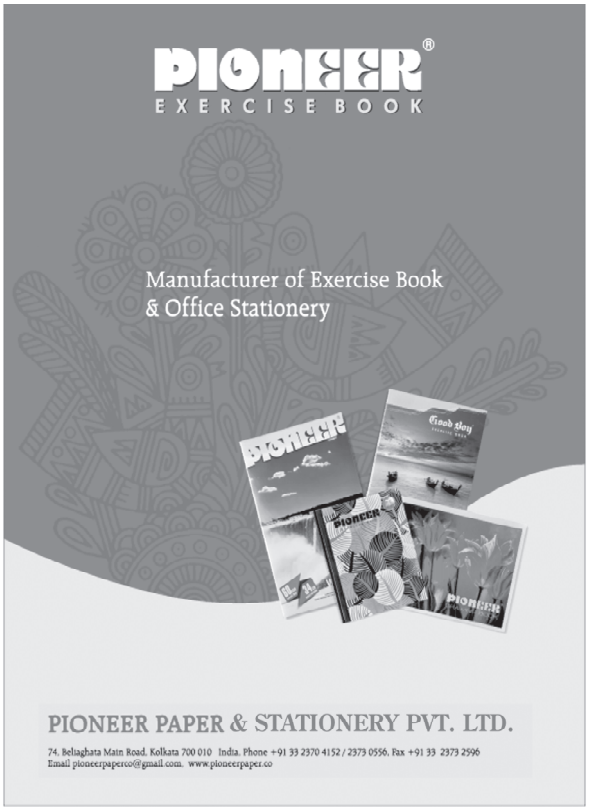

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

হিন্দুত্বই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্র

পিন্টু সান্যাল

মানুষ তার অস্তিত্বের শুরু থেকেই প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার কারণ ও বিভিন্নতার মধ্যে একটি যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে চলেছে। প্রকৃতির এই নিয়ম যে যত বুঝতে পেরেছে সে ততই তা নিজের অনুকূলে নিজের বিকাশের কাজে লাগিয়েছে। সেই বিকাশ কখনো বহির্জগতের কখনো অন্তর্জগতের। মানুষ বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সমাজ, জাতি ও দেশ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতি ও রাষ্ট্রের গঠন একই নিয়মে হয়নি।

ইউরোপীয় দার্শনিকরা জাতি গঠনের মূল হিসেবে কখনো ভাষাগত ঐক্যের কথা বলেছেন, কখনো রাজতন্ত্রকে 'জাতি' গঠনের ভিত্তি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতবর্ষের ভাষাগত বিভিন্নতা, আচার- অনুষ্ঠান পালনের বিভিন্নতা বরাবরই তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু তারা ইউরোপীয় 'জাতি' গঠনের তত্ত্ব দিয়ে ভারতবর্ষের ভাষা- পোশাক-আচার আচরণের বিভিন্নতার মধ্যে থাকা ঐক্যসূত্রকে চিনতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' (আত্মশক্তি) প্রবন্ধে এই ব্যর্থতার কথা বলেছেন এভাবে— 'এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে এক ভাবে সাধিত হয় না। এইজন্য ইউরোপীয়ের ঐক্য এবং হিন্দুর ঐক্য এক প্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে কথা বলা যায় না। সে ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পার— কারণ নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে, ইউরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।'

ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের ধারণা (Concept) মূলত রাজনৈতিক ও সার্বভৌম ক্ষমতা ভিত্তিক। ভারতবর্ষের 'জাতীয়তা'-র ভিত্তি সংস্কৃতি যা তার ভাষা-মত- পরিধানের বিভিন্নতাকে ছাপিয়ে গেছে এবং এই সংস্কৃতির মূল নিঃসন্দেহে তার 'ধর্ম'-এর মধ্যে প্রোথিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে এই ধারণাটিকেই সুসংবদ্ধ করেছেন... ''হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেককে পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে সাধারণ ভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

...ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিতেছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করি। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি— জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায়, প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি। ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। ...সৈন্য ও পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্‌বেজিত করিয়া ফিরে নাই। সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্ম ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি আদায় করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা হইয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।''

আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা না করলে স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এর অভাবে স্বাধীনতা

কখনো সমৃদ্ধি বা সুখের আস্বাদ দিতে পারে না। যতদিন আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত না হবো ততদিন আমরা আমাদের উন্নতি সাধন করতে পারবো না।

ঋষি অরবিন্দ বলেন, 'অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ— কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে 'মা' বলিয়া জানি— ভক্তি করি, পূজা করি।' ভগিনী নিবেদিতাও ভারতবর্ষকে এক জীবন্ত মাতৃরূপে দেখেছেন, 'হিমালয় হতে কন্যাকুমারী এক স্পন্দিত, জীবন্ত, অখণ্ড অস্তিত্ব। এই মাতৃভূমি ভারতবর্ষ নিজ জন্মদাত্রীর মতো। শ্রদ্ধা কর, সেবা কর, ভালোবাসো, আগলে রাখ।'

বহু যুগ আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা গেয়ে গেছেন :

'উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।'

(সমুদ্রের উত্তর দিকে এবং হিমালয়ের দক্ষিণ দিক ব্যাপী যে ভূমি, তারই নাম ভারতবর্ষ এবং তার সন্ততি হলো ভারতী)

আজও দৈনন্দিন স্নানপর্ব সম্পন্ন করার সময়ে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা ও সিন্ধু থেকে কাবেরী পর্যন্ত সারা দেশের পবিত্র নদীগুলির নাম জপ করে সাধারণ মানুষ...

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু।।'

এই ভূমিকেই ঋষিকবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অমর সংগীত 'বন্দেমাতরম্'-এ মাতৃভক্তিতে প্রণাম জানিয়েছেন। যে গান কত সহস্র দেশপ্রেমিক যুবকদের হৃদয়কে আবেগে আপ্লুত করেছে, যার ফলে তারা হাসতে হাসতে দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির মঞ্চে উঠেছে। কবি গেয়েছেন—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী।'

---এই ভূমিকেই আমাদের সকল সত্যদ্রষ্টা, মুনি ঋষিগণ মাতৃভূমি, 'ধর্মভূমি', কর্মভূমি ও পুণ্যভূমি এবং বাস্তবিক দেবভূমি ও মোক্ষভূমি বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় চিন্তায় এই ভাবনাকেই রাষ্ট্র বলা হয়েছে। রাষ্ট্র এখানে সম্পূর্ণভাবে ভাবাত্মক বা সাংস্কৃতিক শব্দ। ভারতীয় সংস্কৃতি এ দেশকে মাতা রূপে পূজার কথা বলে, স্বদেশ-রক্ষার কথা বলে যা এদেশের সন্তানদের রাষ্ট্রধর্ম এবং এদেশের জাতীয়তাবোধের উৎস।

ভারতবর্ষের ইতিহাস কমপক্ষে ৯০০০ বছরের পুরনো। ভারতবর্ষ একসময় অধ্যাত্ম, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল। প্লাস্টিক সার্জারি, শূন্যের আবিষ্কার, যোগ ও আয়ুর্বেদ চর্চা, শিখ, জৈন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এখানে। এই মহান দেশের সাংস্কৃতিক বিস্তৃতি পূর্বে ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়া থেকে পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত ছিল। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার প্রতি সন্দিহানদের এ প্রশ্ন কি মনে জাগে না যে, কোনো এক ঐক্যসূত্র ছাড়া ভারতবর্ষ কীভাবে এক সময় 'বিশ্বগুরু'র মর্যাদা পেয়েছিল? তারা নিশ্চয়ই জানেন বলেই ভারতবর্ষের সেই সনাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে দেশকে বিপথে চালিত করতে চান শুধুমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য।

ভারতবর্ষের 'জাতীয়তা' ইংরেজদের সৃষ্ট নয়

বৈদেশিক শাসনে শাসনাধীন একটি জাতির স্বকীয় সত্তাকে দাবিয়ে রাখা হবে তা বলাই বাহুল্য। ইংরেজরা এই কাজটি সুচতুরভাবে করেছিল। তারা ভারতবর্ষের জাতীয়তা ও অখণ্ডতার মূল ভিত্তি 'ধর্ম'-এর অপব্যাখ্যা ভারতীয় মননে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করলো ম্যাক্সমূলারের মতো বেতনভোগী ইতিহাস ও ধর্ম বিকৃতকারীকে নিয়োগ করে। একদিকে ম্যাক্সমূলার বেদ-উপনিষদের ভুল ব্যাখ্যা করলেন, আর অন্যদিকে আর্য-অনার্য তত্ত্ব, বেদে বর্ণিত সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে ভারতবর্ষের ঐক্যের ভিত্তি দুর্বল করার চেষ্টা করলেন। দুঃখের বিষয়, স্বাধীন ভারতের ক্ষমতা যাদের হাতে ন্যস্ত হলো, মেকলীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা ইংরেজদের পরিবেশিত বিকৃত তথ্যই শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজে ও রাজনীতিতে প্রচারিত করলেন।

গীতার ধর্ম, শিবাজীর মতো দেশনায়কদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতমাতাকে শৃঙ্খলামুক্ত করতে আত্মবলিদানে প্রস্তুত যুবসম্প্রদায়ের ঐক্য কখনোই ইংরেজ জাতির প্রতি দ্বেষ-ঘৃণা থেকে সৃষ্টি হয়নি। ভারতবর্ষের জাতীয়তার ধারণা সুপ্রাচীন অখণ্ড ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকমান্য তিলক তাঁর গীতারহস্য পুস্তকে ভারতের পুনরুত্থানের দার্শনিক পটভূমিকা আলোচনা করেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ, বীর সাভারকার তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রবাদের যোগসূত্র দেশবাসীকে বোঝাতে সমর্থ হন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সংবিধানের ১ নং ধারা 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত' দিয়ে শুরু হলেও ক্ষমতাসীন দল ভুলে গিয়েছিল যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৯৪৭ থেকে শুরু হয়নি। রাজনৈতিক ভাবে ভারত খণ্ডিত হয়েছিল কিন্তু ইউরোপীয় দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে তারা ভারতবর্ষকে সাংস্কৃতিক ভাঙনের পথে এগিয়ে দিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ইসলামিক নেতাদের লক্ষ্যপূরণের জন্যে শুরু হওয়া খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় সংস্কৃতির পথ থেকে বিচ্যুতির যে ধারা শুরু করেছিল তা ক্রমশ বন্দেমাতরমের প্রসঙ্গে মুসলমান নেতাদের বিরোধিতাকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্য দিয়ে জরুরি অবস্থার সময় অসাংবিধানিক ভাবে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সেকুলার শব্দ যুক্ত করে তা অব্যাহত রাখা হয়। এই বিপথগামিতাকেই ভারতবর্ষের অবনমনের জন্য দায়ী করা যায়।

'অখণ্ড ভারত'-এর ঐতিহাসিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত

দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্য আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ খণ্ডিত হলো। যারা দ্বিজাতি তত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, যারা ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের যোগস্থাপনে লজ্জাবোধ করতেন তারাই এদেশের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন। ফলস্বরূপ তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে করা একই ভুল যা দ্বিজাতিতত্ত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল তার পুনরাবৃত্তি করে, ভারতবর্ষের স্বকীয় সত্তাকে অগ্রাহ্য করলেন এবং এক মিশ্র, জোড়াতালি দেওয়া সংস্কৃতির দিকে দেশকে নিয়ে গেলেন। যেন পাকিস্তানের মতোই ভারতবর্ষ ১৯৪৭-এ তৈরি হওয়া এক নতুন দেশ। যেন ভারতবর্ষের নিজস্ব সুপ্রাচীন গৌরবময় কোনো ইতিহাস

নেই। কিন্তু ইতিহাস যে অন্য কথা বলে। দীর্ঘ প্রায় হাজার বছর বৈদেশিক শাসনের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের এক গৌরবময় ইতিহাস আছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিক ঐতিহাসিক হোরোডেটাস তার বই 'The Histories'-এ India ও Indian কথাটি ব্যবহার করেন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মেগাস্থিনিস 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনা দেন।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষকে সিন্ধু (হিন্দু) বলে উল্লেখ করেন যা থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি এক অখণ্ড সভ্যতা হিসেবে দেখিয়েছেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক জুয়াং জাং এই দেশকে 'সিন্তু' হিসেবে উল্লেখ করে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের মানুষ ও প্রকৃতির বিবরণ দেন যা থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে একটিমাত্র অখণ্ড সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে আরবীয় আক্রমণকারীরা সপ্তম শতাব্দীতে সিন্ধ প্রদেশ দখলের পর এদেশের গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থের যে অনুবাদ করেছেন (যেমন ভারতীয় সংখ্যাকে আরবীয়রা 'আল-হিন্দসা' বলতো) তা সহজেই 'হিন্দ'-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। একাদশ শতাব্দীতে আলবিরুনি তারিখ-আল-হিন্দ-এ বর্তমান পাকিস্তানকে 'হিন্দু' বলে উল্লেখ করেন। মহাভারতের নবম অধ্যায় ভীষ্ম পর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের বিশদ বিবরণ দিয়ে তাকে 'ভারত' নামে উল্লেখ করা হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে।

খ্রিস্টীপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতমুনি রচিত নাট্যশাস্ত্র ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্নতা-সহ একে একটিমাত্র সাংস্কৃতিক সভ্যতা হিসেবে উল্লেখ করেছে। এই গ্রন্থের ১৭তম অধ্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশকে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করা হয়। কলহন তার রাজতরঙ্গিনীতে মহাভারতের যুদ্ধে কাশ্মীরের রাজার নাবালকত্বকে সারা ভারতবর্ষে ধর্ম প্রতিষ্ঠার এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

শিখদের পবিত্র গুরু গ্রন্থ সাহিব মোট চারবার ভারতীয় উপমহাদেশকে 'হিন্দুস্তান' বলে উল্লেখ করে। লক্ষণীয়, এই পবিত্র গ্রন্থের কোথাও পঞ্জাব শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। অষ্টম শতাব্দীতে কেরলের সন্ন্যাসী আদি শঙ্করাচার্য 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' মন্ত্র নিয়ে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে জগন্নাথপুরী, দ্বারিকা, বদ্রীনাথ ও শৃঙ্গেরীতে যে চারটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন তা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। শিবময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে একসূত্রে বেঁধেছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী কমিউনিস্টদের রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী

মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তিকে পুরোপুরি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে যেখানে মানুষের আবেগ কিংবা অনুভূতির কোনো স্থান নেই। মার্কসবাদ শুধুমাত্র অর্থনীতি, উৎপাদন ও মালিকানার ভিত্তিতে সমাজকে দেখেছে এবং এই তত্ত্বে সমাজ কেবল পরস্পরের অর্থনৈতিক স্বার্থবিরোধী, সর্বদা সংগ্রামরত কতকগুলি শ্রেণীর সমষ্টি। মার্কসবাদ অনুযায়ী শ্রেণী বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকরা মনে করতেন যে তাদের মালিকানা থাকবে না অতএব কোনো এক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই ব্যক্তিগত মালিকানাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। শ্রেণী না থাকলে রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন নেই। মার্কসবাদকে রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রয়োগ করতে গিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবাধীন পূর্ব জার্মানি অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়ে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। উত্তর কোরিয়ায় সাম্যবাদের নামে স্বেচ্ছাচারী সেনানায়ক বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতা দখল করে রেখেছে। বর্তমান চীন সাম্যবাদের নামে নিজের দেশের মানুষের মানবাধিকার, স্বাধীন ধর্মচর্চা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে দেশকে এক সরকারি কারাগারে পরিণত করেছে। হংকং, তিব্বত চীনা-আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এ সব উদাহরণ থেকে সন্দেহাতীতভাবে কমিউনিজমের রাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ভুল প্রমাণিত হয়। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে গড়া সমাজ আত্মঘাতী হয়েছে।

অন্যদিকে ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতি মহম্মদ বিন

কাশিম, মহম্মদ ঘোরি থেকে শুরু করে মোগল শাসনে ঔরঙ্গজেব, টিপু সুলতান তার পরে ইংরেজদের আঘাত সত্ত্বেও নিজের সনাতন সংস্কৃতি সমাজে জিইয়ে রাখতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশলাভ পূর্ব্বক ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসিক, যবন, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুর্কি সকলেই আসিয়াছে এবং সিন্ধুপারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছুদিনের জন্য অধিকৃত করিয়া পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণ স্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোনো জাতি পৃথিবীতে নাই এবং কখনও ছিল কি না সন্দেহ।' পৃথিবীতে যেমন সংঘাত ও প্রতিযোগিতা আছে তেমন সহযোগিতাও আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোনো সংঘাতের কথা বলেনি। সমাজ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি হলেও ভারতীয় সমাজ স্বয়ংভূ। সমাজ কোনো থিসিস, অ্যান্টি থিসিস, সিন্থেসিসের ফল নয়। ভারতীয় সমাজ অর্থের ভিত্তিতে সমাজকে ভাগ করে বিদ্রোহের কথা বলেনি। সমাজকে দায়িত্ব অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছিল, যেখানে শুধুমাত্র নিজের অংশ বুঝে নেওয়ার লড়াই ছিল না, ছিল আত্মত্যাগের মাধ্যমে সমাজের ঐক্য সুদৃঢ় করার আহ্বান। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বদেশী সমাজ' (আত্মশক্তি) প্রবন্ধের অংশবিশেষ প্রণিধানযোগ্য--- '---একথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে— আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহু দুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, ...সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড়ো করিয়া জানায় নাই— সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।'

ভারতীয় ধর্মাশ্রিত সনাতন সমাজ সর্বদাই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে এবং সেই পথই যে আমাদের সমাজ গঠনের পন্থা হওয়া উচিত তা কবিগুরু ওই একই প্রবন্ধে বলেছেন এই ভাবে... 'আমরা আমাদের অতি দূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই— আর আমরা বলিব, আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না? —স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব--- তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে সমাজকে, স্বদেশকে মাতা রূপে সেবা করার আহ্বান জানিয়েছেন— 'আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল— আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্মকে অপমানিত করিব? আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না?

---আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈঃ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে, আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'! একবার স্বীকার করো, মাতার সেবা স্বহস্তে করিবার জন্য অদ্য আমরা প্রস্তুত হইলাম; একবার স্বীকার করো যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা করো, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।'

'অখণ্ড ভারত' এক নিশ্চিত লক্ষ্য

দীর্ঘদিন বৈদেশিক আক্রমণকারীদের শাসনাধীন থাকলেও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়তার বিলুপ্তি হয়নি, সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা হারিয়ে যায়নি। অখণ্ড ভারতবর্ষের ভিত্তি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ বোঝাতে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একাত্ম মানবদর্শন পুস্তকে এইভাবে বুঝিয়েছেন— 'একদিন এক খরিদ্দারের দাড়ি কামাইবার সময় এক নাপিত গর্ব করিয়া বলিতেছিল যে তাহার খুরটির বয়স ষাট বৎসর। খরিদ্দার বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল— 'খুরটির হাতলটি তো খুব চকচকে। তুমি ষাট বৎসর কেমন করিয়া এমন চকচকে রাখিলে?' নাপিত কৌতুকবোধ করিয়া বলিল তাও কি সম্ভব? হাতলটা ছয় মাস পূর্বে বদল করা হইয়াছে।'

খরিদ্দার তখন কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রশ্ন করিল, 'ইস্পাতটি কতদিনের?' উত্তর হইল, 'তিন বৎসর পূর্বের'। অর্থাৎ হাতল বদলাইয়াছে, ইস্পাত বদলাইয়াথে কিন্তু ক্ষুরের পরিচয় বদলাই নাই। ঠিক সেইরকম প্রত্যেক জাতির একটি আত্মা রহিয়াছে ইহার একটি বিশিষ্ট নাম রহিয়াছে।'

পণ্ডিত দীনদয়াল এই বৈশিষ্ট্যকে জাতির 'চিতি' অর্থাৎ চৈতন্য রূপে অভিহিত করেছেন যা তার নিজস্ব প্রকৃতি এবং কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার পরিণতি নয়। স্বাধীনতার সময় দেশভাগ হলেও সনাতন অখণ্ড ভারতবর্ষের সেই 'চিতি' আজও অক্ষুণ্ণ। শুধু আমাদের মনের মধ্যে সেই চেতনাকে পালন করা

প্রয়োজন। দেশবাসীর মনে অখণ্ড ভারতের চেতনাকে জাগ্রত করতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রতি বছর ১৪ আগস্ট 'অখণ্ড ভারত দিবস' রূপে পালন করে থাকে।'

জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বেদনা ইহুদিরা কখনো ভুলে যায়নি। তাদের এই ব্যথাকে তারা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিল। এজন্য তারা একটি সুন্দর পন্থা অবলম্বন করেছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে নববর্ষের শুভেচ্ছা পত্রে ইহুদিরা লিখতো, 'আগামী বছর জেরুজালেমে দেখা হবে'। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে যখন তারা লিখতেন আগামী বছর জেরুজালেমে দেখা হবে তখন কি জানতেন না যে আগামী বছর কেন তার জীবদ্দশাতেই পরের বছর বছর জেরুজালেমে তাদের দেখা হবে না? তারা তা ভালোভাবেই জানতেন এবং তবুও মনের মণিকোঠায় তুষের আগুনের মতো স্বদেশ-স্পৃহা জ্বালিয়ে রাখতে কথাটা বলতেন। আরব দেশগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল ইহুদিদের একটি স্বাধীন দেশ বলে ঘোষিত হয়েছে। ভারতবাসীর মনেও যে ভারতমাতার ছবি আছে তা একদিন অখণ্ড ভারতকে রাজনৈতিক রূপদান অবশ্যই করবে।

অখণ্ড ভারতের পথে পদক্ষেপ

যে কমিউনিস্টরা ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাকে অস্বীকার করেন, তারা গণতন্ত্রীয় কাঠামোকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসতে চান কিন্তু সেই গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ সংসদে হামলাকারী আফজল গুরুর ফাঁসির বিরোধিতা করেন। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' স্লোগান তুলে ছাত্রসমাজকে বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতবর্ষের একতা ও অখণ্ডতার পক্ষে এইরকম কাজ বিপজ্জনক ও দেশবিরোধী। ভারতবর্ষ থেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগনিস্তানে নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়ে অখণ্ড ভারতের সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালিত হচ্ছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতার নামে উত্তর-পূর্ব ভারতকে মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করার কথা বলে শারজিল ইমাম আজ আইনের ঘেরাটোপে।

শুধু তাই নয়, ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে কাশ্মীরে হিন্দুদের প্রতি দীর্ঘদিনের দ্বিচারিতা, বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে ভারতের অখণ্ডতাকে বলশালী করা হলো। কাশ্মীরের ঐতিহ্যকে কয়েক শতক ধরে সযত্নে লালন পালন করা বিতাড়িত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরে ফেরার পথ প্রশস্ত করা হলো। এক সময় মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের যে ভ্রাতৃত্ববোধ ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া-সহ পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছিল, ভারতীয় সংস্কৃতির সেই প্রাণপুরুষের জন্মভূমি অযোধ্যাতে রামমন্দির পুনর্নির্মাণ নিঃসন্দেহে অখণ্ড ভারতের সেই রূপ ফিরে পাওয়ার দিকে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। □

পরলোকে শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

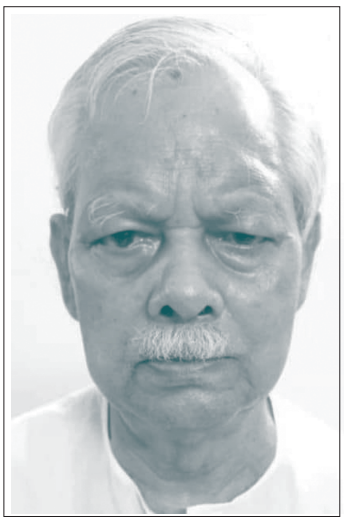

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণতম প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত (৯৮)-এর প্রয়াণের ৩ দিন পর আরও এক প্রবীণ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর নগর প্রচারক, নদীয়া জেলা প্রচারক, জলপাইগুড়ি বিভাগ প্রচারক, প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ ও প্রান্ত সেবাপ্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন।

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ পাত্র গত ৬ সেপ্টেম্বর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ১৯৬১-৬২ সালে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজে পড়ার সময় তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। মণ্ডলকুলি গ্রামে তিনিই শাখা শুরু করেন। তাঁর প্রেরণাতেই তাঁর মেজভাই সুকুমার পাত্র প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি খাতড়া মহকুমার কার্যবাহের দায়িত্ব দীর্ঘদিন পালন করেন। তাঁর নিরন্তর যোগাযোগে মহকুমার বিভিন্ন স্থানে শাখা শুরু হয়। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তিওড়ের প্রবীণ স্বয়ংসেবক নৃপেশচন্দ্র লাহা গত ২৮ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি তার সহধর্মিণী ও ২ কন্যা রেখে গেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় হিলি খণ্ডের গ্রামে গ্রামে শাখা শুরু হয়। তিনি মালদা জেলার গাজোলের কয়লাবাদে বিস্তারক ছিলেন।

দিদি কি বেহালা বাজাতেও পারেন?

উৎসবপ্রিয়েষু দিদি,

বিজয়ার শুভেচ্ছা। এটা কিন্তু মন থেকে নয়, নিয়মমাফিক। কারণ, এখন বাঙ্গলার যা পরিস্থিতি তখন শুভেচ্ছা জানানোর মন নেই। কিন্তু কী করা যাবে! আর কিছু না থাকুক বাঙ্গলার তো উৎসব আছে। তাই উৎসব শেষের নিয়মও তো পালন করতেই হবে!

আচ্ছা দিদি, আপনি কি বেহালা বাজাতে পারেন? এই প্রশ্নটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে এই চিঠি লিখতে বসার পরে। আমি যখন আপনাকে চিঠি লিখছি তখন কলকাতারই একটা অংশ জ্বলছে। সাম্প্রদায়িকতার আগুনে। অন্য জ্বালাপোড়া তো আছেই! আপনাকেও সেদিন টিভিতে দেখলাম আপনি একতারা বাজাচ্ছেন। রাস্তায় নেমে নাচলেনও। তাই জিজ্ঞেস করা আর কী! এর আগে আপনার সাহিত্য সৃষ্টি থেকে ছবি আঁকা দেখেছে বাঙ্গলা। এবার নাচও দেখল। জানেন দিদি, মালবাজারে যাঁরা নদীর স্রোতে তলিয়ে গিয়েছে তাঁরাও চোখের জল ফেলতে ফেলতে আপনার নাচ দেখছিল।

আপনি আসলে বাঙ্গালিকে উৎসবে ভুলিয়ে রাখতে চাইছেন। যে পথে চাকরিপ্রার্থী দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে দিনের পর দিন ধর্নায় বসে সেই রাস্তাতেই উৎসবের কার্নিভাল হলো। কত আলো, কত রং, কত নাচ! ওদিকে আদালত দেখছে দুর্নীতির পাহাড়। আপনার সরকারের আমলে স্কুলে নিয়োগে যত কর্তা যুক্ত ছিলেন মন্ত্রী-সহ তাঁরা সবাই গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আপনি বাঙ্গালিকে উৎসব আর ছুটিতে ভরিয়ে দিয়েছেন। জবাব নেই আপনার।

বাঙ্গলায় অতীতে দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো ভালো ভাবেই হতো। কিন্তু আপনি সব বারোয়ারিকে পঙ্গু করে দিয়েছেন। আপনি আসার পরে হঠাৎ কী এমন ঘটল যে, রাজ্যের সমস্ত ক্লাব বা পুজো-কমিটিকে সরকারি অনুদান দিতে হচ্ছে? রাজ্যের চরম আর্থিক অনটন চলা সত্ত্বেও আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য এই অনুদান কী করে প্রাধান্য পেতে পারে? সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও টালবাহানা করে চলেছে সরকার। সম্প্রতি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে আত্মহত্যা করতে হয়েছে অবসরের বহু বছর কেটে গেলেও প্রাপ্য পেনশন না মেলায়। সরকারি পদের নিয়োগে কবেই দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়েছে। কিছু পদের চাকরি অবশ্য বিক্রি চলেছে এবং চলছে। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীরা পরীক্ষায় পাশ করেও খোলা আকাশের নীচে দিনের পর দিন অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছেন আর অযোগ্যরা চাকরি পাচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের কল্যাণে। এত কিছুর পরে এই অনুদান হাস্যকর মনে হয় না?

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীরা পরীক্ষায় পাশ করেও খোলা আকাশের নীচে দিনের পর দিন অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছেন আর অযোগ্যরা চাকরি পাচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের কল্যাণে। এত কিছুর পরে এই অনুদান হাস্যকর মনে হয় না?

সাময়িক ক'দিনের জন্য এই উৎসবের মোচ্ছব কি মানায়? অবশ্য মোচ্ছব ক'দিনের নয়। সেই কবে থেকে আপনি পুজো শুরু করে দিয়েছেন। ১ সেপ্টেম্বর সরকারি শোভাযাত্রা দিয়ে শুরু আর ৯ অক্টোবর সরকারি কার্নিভাল দিয়ে আপনার নৃত্য পরিবেশন দিয়ে শেষ। মহালয়ার আগেই আপনি পুজোর উদ্বোধন করে দিয়েছেন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে আপনার নাম উঠতে পারে। কারণ, ঠাকুর আসেনি, মণ্ডপ তৈরি হয়নি এমন হাজার খানেক পুজো আপনি পুজোর আগেই উদ্বোধন করে দিয়েছেন।

দুর্গাপুজো পাঁচ দিনের। আপনি সেই পাঁচ দিনকে টেনে এগারো দিন সরকারি ছুটি করে দিয়েছেন। কালীপুজোও এক দিনের পুজো। ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি এক দিনই ছুটি থাকত। হঠাৎ এক দিনের এই উৎসবকে টেনে প্রথমে দু'দিন, তারপর তিন দিন করেছেন। আগে ছটপুজোয় ছুটি থাকত বিহারে, পশ্চিমবঙ্গে নয়। এখন এই রাজ্যে এক দিনের নয়, পর পর দু'দিন ছুটি বরাদ্দ হয়েছে। তার কারণ কি তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না। দিদি, বিরোধীরা বনধ্ ডাকলে কর্মদিবস নষ্ট হয় কিন্তু ছুটিতে হয় না বুঝি!

যাক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। শুধু একটাই কথা— বাঙ্গালিকে নাচিয়েছেন, বেশ করেছেন কিন্তু আপনি নিজে না নাচলেই ভালো হতো।

Sl. No	Parameter	Unit	1972 – at the time of Statehood	Nov-21 (Provisional)
1	Individual Household Domestic Connections	Nos	Nil	3,88,623
2	Sinking & Commissioning of Deep Tube Wells	Nos	02	2,339
3	Small Bore Tube Well	Nos	Nil	3,501
4	Iron Removal Plant	Nos	Nil	1,013
5	Surface Water Treatment Plant	Nos	01	55
6	Water Testing Laboratory	Nos	01	21
7	Individual Household Toilet	Nos	Nil	5,61,389

‘চুরি আমাদের ভিত্তি, জেল আমাদের ভবিষ্যৎ’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘ভয়ংকর পরিস্থিতি’--- অস্ফুটে কথাগুলি বললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় নেতা ও সাংসদ। অনেকটা বাধ্য হয়েই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের জন্য উপরের লাইন ব্যবহার করছি— ‘চুরি আমাদের ভিত্তি, জেল আমাদের ভবিষ্যৎ’। বিদেশে বসবাসকারী এক বন্ধুর কাছ থেকে এই লাইন ধার নিলাম। এই রাজ্যের তৃণমূল নেতাদের সম্পর্কে বিদেশের প্রবাসী বাঙ্গালিরা নাকি ঠাট্টা করে এখন এসব বলছেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডন ভ্রমণ করেছেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মতো হীন শিল্প আর অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, খুচরো শিল্পপতি, কয়েকটি আদেখলা চাকুরিজীবী সিইও আর স্তাবক সাংবাদিকের দল। তাদের মধ্যে একজন লন্ডনের চামচ চুরি করে ধরা পড়েন। মমতা কী ধাতের মানুষ বিদেশের বাঙ্গালিরা বিলক্ষণ জানেন। এই মুহূর্তে আমার বন্ধুর কথাটা মানছি না। মেনে না নিলেও বাঙ্গলার মাটিতে মমতা আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে এই আওয়াজ উঠেছে তা আমি মানতে বাধ্য। সিপিএমের অত্যাচারি শাসনের শেষে ২০০৮ থেকে ২০১১-র মধ্যে বাম বিরোধী ঘৃণা মানুষের মধ্যে দেখেছিলাম। রাজ্যজুড়ে আওয়াজ উঠেছিল ‘লাল হটাও, বাংলা বাঁচাও’। সেই জনরোষে ধূলিসাৎ হয়ে যায় ৩৪ বছরের স্বৈরাচারী মার্কসবাদী কমিউনিস্ট শাসন। বাম বিদায় বা পাপ বিদায় হওয়ায় মানুষ হাঁফ ছাড়েন। বামেদের ‘জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য’ সিপিএম তাসের ঘরের মতো ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে। ভাঙা কোমর এখনও জোড়া লাগেনি। কংগ্রেস এ রাজ্যে জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে।

দু’ বছরের মধ্যে (২০১৩) রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারেন স্বৈরাচারী সিপিএমের বদলি বিষবৃক্ষ মমতাকে পুঁতে তারা কী ভুল করেছেন। বারো বছর পর সেই বিষগাছটা ভাঙতে চলেছে। ওই সময় সারদা চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি রাজ্যের মাথায় ভেঙে পড়ে। সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন তার প্রথম চিঠিতেই সিবিআই-কে জানিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ খবরের কাগজের সম্পাদক মমতার নাম নিয়ে তার কাছ থেকে কীভাবে ২০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। সেন এখন জেল খাটছেন। মমতার নামের সঙ্গে সে চিঠিতে অনেক নেতার নাম ছিল। সবাই নিজের মতো করে পিঠ বাঁচিয়ে রেখেছেন। তবে মমতার সাদা আর নীল কাপড়ে কাদার ছিটে আজও মোছেনি। লড়াকু মমতা ‘ভড়াকু’ বা ‘ভড়কে’ যাওয়া নেত্রী হয়ে গিয়েছেন। জনগণের নজরে তার বিশ্বাসযোগ্যতা টলে গিয়েও ‘ডিফল্ট’ বা ত্রুটি হয়ে থেকে গিয়েছে। তাই সমানে জিতে চলেছেন। এখন পর্যন্ত মমতার বদলি মুখ জোগাড় করতে বিরোধীরা ব্যর্থ। দুর্নীতির পুকুরে আগেই ডুবে গিয়েছিলেন মমতা আর এখন দুর্নীতির নদীতে ভেসে চলেছেন। বিজেপি বলে ‘ডাকাত রানি’। আমি ডাকি ‘কুরুমাতা’। তিনি গান্ধারী নন। চেষ্টা করেও হতে পারবেন না। কারণ তিনি দুর্নীতির উৎসমুখ।

সিপিএমের আমলে বেড়েছিল সারদা আর অন্যান্য বেআইনি চিট ফান্ডের ব্যবসা। মমতা দুর্নীতিবাজ সিপিএম নেতাদের নাকি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেন? সেই দুর্নীতি-ঠাকুরের প্রধান পুরোহিত হয়ে ওঠেন মমতা। তাঁর নেতা মন্ত্রীরা এখন জেলে। কুড়ি জন জাতীয় কমিটির নেতার মধ্যে আট জন সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত বলে অভিযুক্ত। রাজ্যের রাজনীতিতে সদ্যোজাত বিজেপি স্লোগান দিয়েছে ‘চোর ধরো, জেল ভরো’। এদের নাম সকলের জানা। সে ঘৃণ্য নাম আর লিখতে চাই না।

তা বলার জন্য মমতার আস্তাবল আর কেনেলে অনেক সাংবাদিক রয়েছেন। বাম মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর পূর্বসূরী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সম্পর্কে ব্রিগেডের সভায় বলেছিলেন, ‘ওই নামটা মুখে আনতে ঘেন্না করে’। রাজনৈতিক মহল বলে ওটা নাটক। ‘মানু’ বা সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বোঝাপড়া নাকি ছিল তলায় তলায়। বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলেন পরিচয়। সামনে ২০২৩ পঞ্চায়েত ভোট। ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোট মমতা জিতেছিলেন গায়ের জোরে। তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় বিরোধীদের তা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির কাদায় হাবুডুবু খাচ্ছেন মমতা। রাজ্যের মানুষ বিরোধীদের মুখ চেয়ে রয়েছেন।

ব্যর্থ হলে ‘নাকে কাঁদুনে’র দল বলে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। মমতার সর্বাঙ্গে দুর্নীতির কালি। এর জন্য মমতা নিজেই দায়ী। মমতার অবক্ষয় প্রমাণ করতে হবে বিরোধীদের। ইডি-সিবিআই চোর ধরবে, কারণ সেটা তাদের কাজ। বিরোধীরা সেই দুধের মাখন খাবেন এটা তাদের কাজ নয়। ৭০ হাজারের বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের সিংহভাগ জেতাটাই এখন বিরোধীদের লক্ষ্য। ২০০৮-এ যেমন জিতেছিলেন মমতা। টলে যায় বাম দুর্গ। তাই তৃণমূল স্তরে পাপের ঘর ভাঙতে বা ধ্বংস করতে কোনো জোট যে হবে না তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। ওপরতলায় আদর্শগত মন কষাকষি এখানে অর্থহীন। কারণ এখন মমতাই টার্গেট। মন কষাকষির রাজনৈতিক ফায়দা পাচ্ছেন মমতা। বিরোধীরা সংখ্যাগুরু হয়েও মমতাই জিতে চলেছেন। সেই সঙ্গে বাড়ছে তাঁর পাপের ঘড়া। তা ধ্বংস করতে শত্রু বা মিত্র বাছাই করা তাই অপ্রয়োজন। □